বাতায়ন

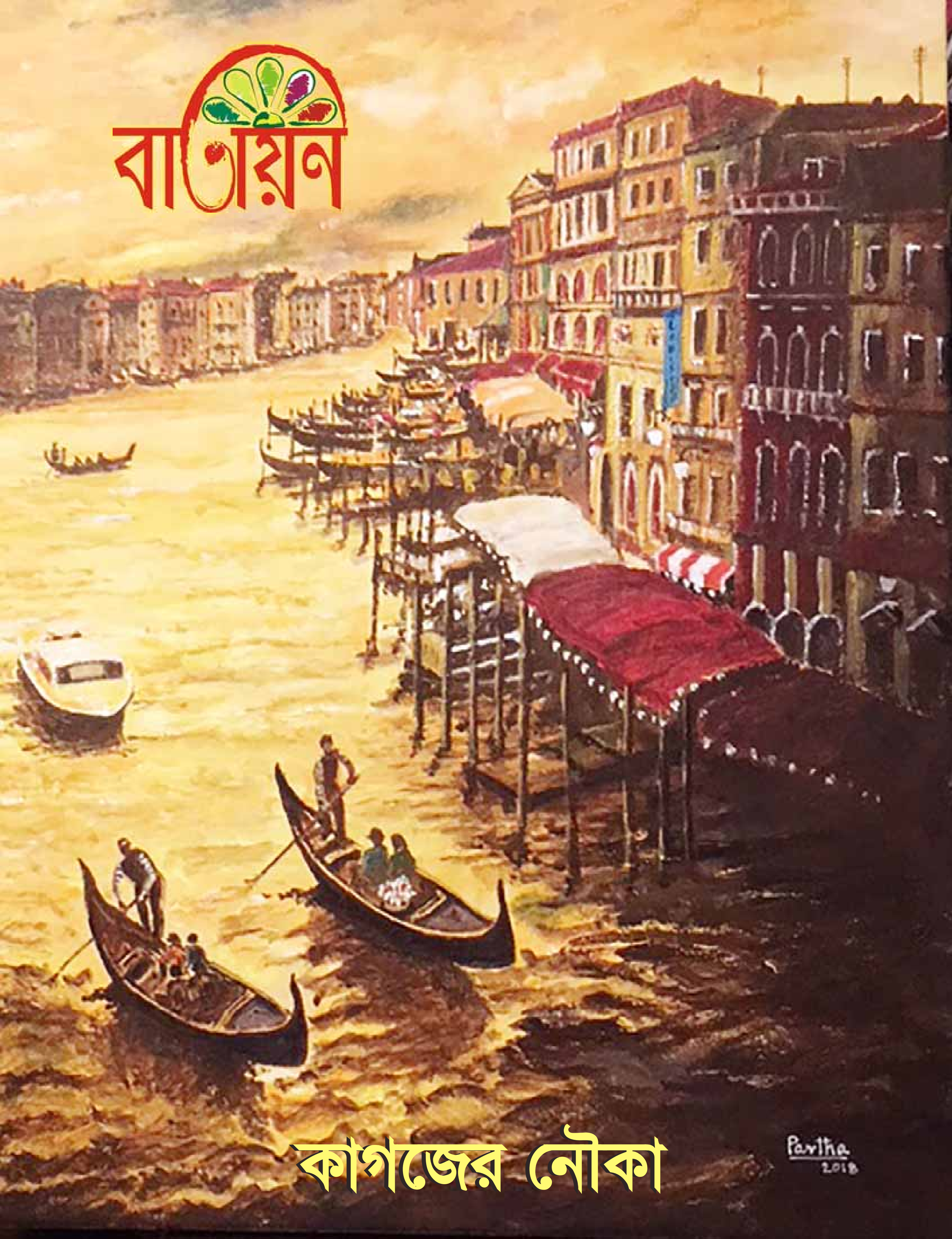

কাগজের নৌকা

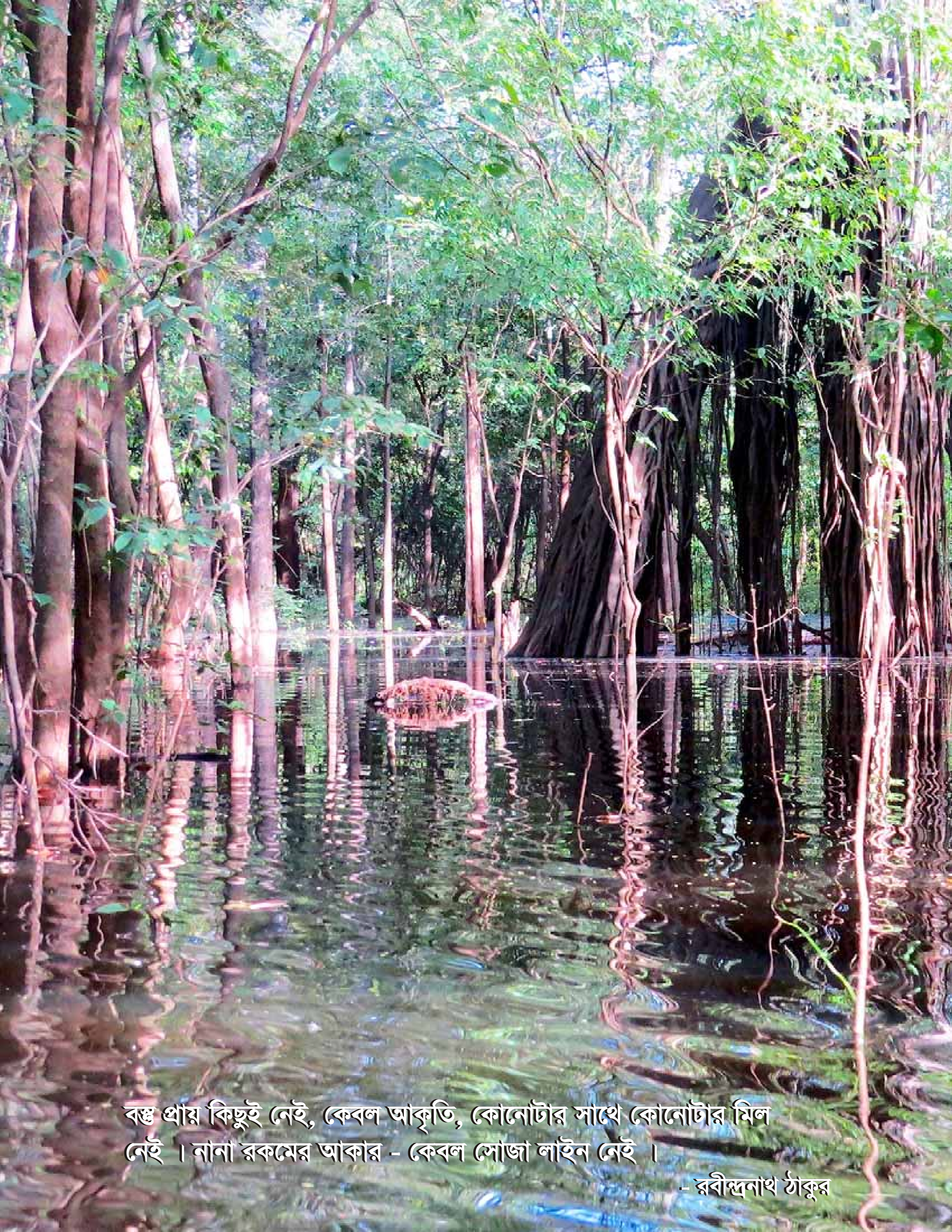
বস্তু প্রায় কিছুই নেই, কেবল আকৃতি, কোনোটার সাথে কোনোটার মিল
নেই । নানা রকমের আকার - কেবল সোজা লাইন নেই ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

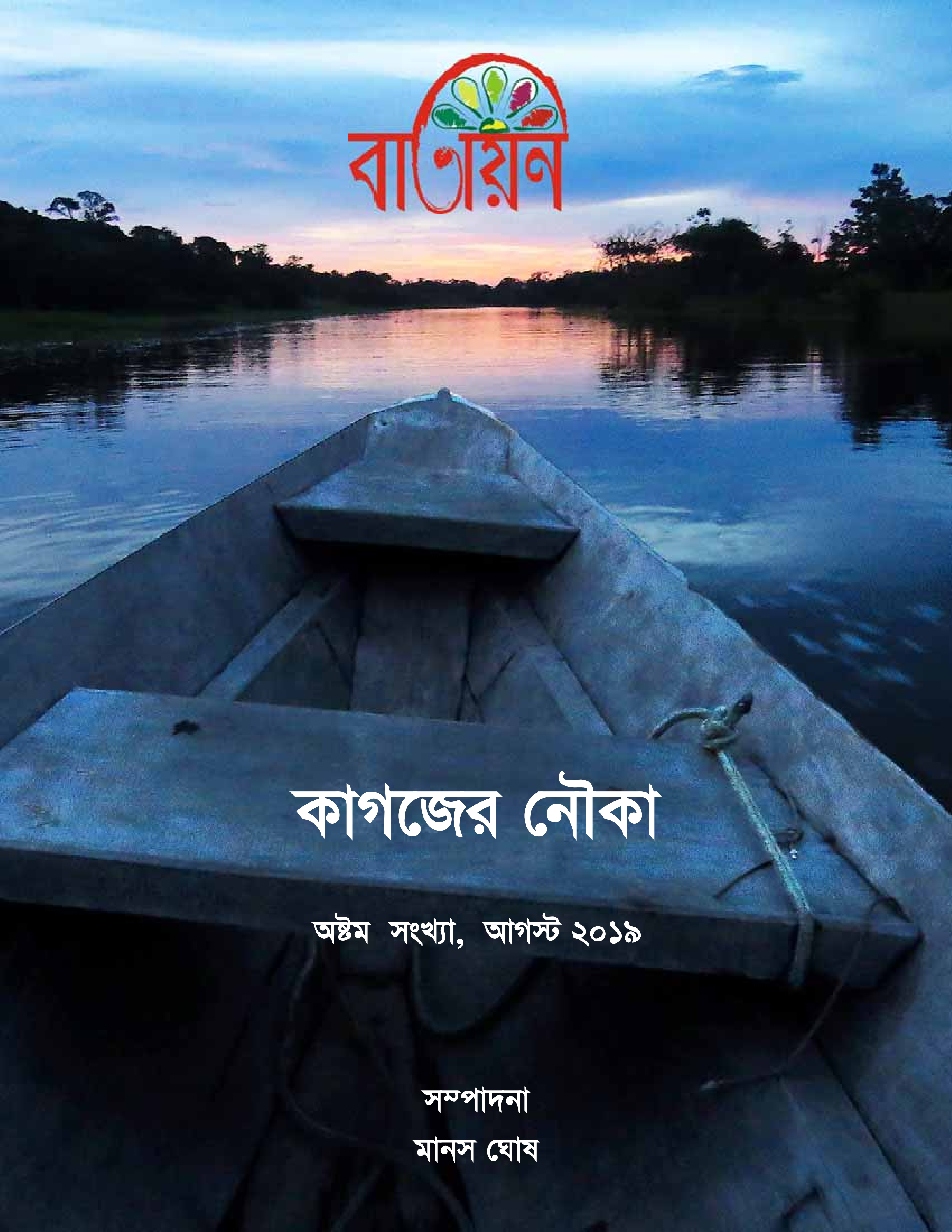

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

অষ্টম সংখ্যা, আগস্ট ২০১৯

সম্পাদনা

মানস ঘোষ

Issue Number 8 : August 2019

Editor
Manas Ghosh, Kolkata, India

Editorial Team
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA
Jill Charles, IL, USA (English Section)

Coordinator
Manas Ghosh, Kolkata, India
Snehasis Bhattacharjee, Kolkata, India

Networking & Communication
Biswajit Matilal, Kolkata, India

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Design and Support
Susanta Nandi, India

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Partha Pratim Ghosh — **Venice Painting : Front Cover**

As a Civil Engineering Graduate from Bengal Engineering College, Shibpur and a Professional Engineer (PE) of Pennsylvania, USA. I practiced Engineering for 52 years in USA, Canada and in India. Moved back to Kolkata from USA in 1987. Pursuing Painting as a hobby very passionately and with dedication. Organizing exhibition of my artwork every year in January, since 2014.

Atanu Biswas, IL, USA — **Inside Front Cover & Title Page**

He is a scientist by profession who came to USA from Kolkata in 1980. However, more people know him as the face of Biswas Records, which he founded in 1994. In recognition of Biswas Record's contribution to Bengali music, the North American Bengali Conference (NABC) twice awarded Dr. Atanu Biswas its highest award at San Francisco Bay Area (1999) and at Detroit (2007). He is embracing photography as his hobby and constantly aiming to develop the photography skill.

Milan Bhattacharjee — **'El Ateneo' in Buenos Aires : Inside Back Cover**

He is the President of Bongo Sanskriti Australia (a registered cultural organisation in Canberra, Australia).
Dr Bhattacharjee has a diverse and wide experience in teaching, scientific research and administration in India and Australia.
Three weeks ago I had the opportunity to visit " El Ateneo" in Buenos Aires (Argentina). This building used to be a Theatre called " Teatro Gran Splendid " and still retains the feeling of a grand theatre it was once and in 1929 had showed the first sound films presented in Argentina. The Director of this Shop informed me that several million overseas book readers visit the bookshop annually.

Tirthankar Banerjee — **Back Cover**

His interest in photography started in student days. Much later the long nights in the dark-room were replaced by hours behind the computer and focus shifted from Black & White to Colour. He likes to show the images as they are and does not approve of computer gimmickry. He loves nature – flowers, birds, trees and all things beautiful. Tirthankar is an engineer, specializing in Renewable Energy and lives and works in Perth, Western Australia.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

বাইশে জুলাই ২০১৯, মহাকাশ গবেষণা অগ্রগতির পথে একটা বিশেষ দিন। চন্দ্রায়ন – ২ যাত্রা শুরু করল মহাকাশের পথে। লক্ষ্য, চাঁদে নামা। এর ঠিক ৯দিনের মাথায় ৩১শে জুলাই ২০১৯ যাত্রা শুরু করল বাতায়নের সংকলন। সাহিত্যের আকাশে নতুন উড়ান। পাঠকের ভালোবাসাই তার চাঁদের অভিলাষ ! কলকাতা প্রেস ক্লাবে, অস্ট্রেলীয় কনসাল জেনারেল শ্রীযুক্ত অ্যান্ড্রু ফোর্ড আবরণ উন্মোচন করলেন "সংকলনে"র। এই অনুষ্ঠানের কথা, নিউজপেপার ক্লিপিংসহ বিশদে পাবেন বাতায়ন বুলেটিনে, তাই এখানে আর পুনরাবৃত্তি করছি না ।

আমি জানি চন্দ্রায়নের উৎক্ষেপণ হোক বা সংকলনের উন্মোচন, এই চোখ ধাঁধানো আলোর আড়ালে আমাদের নিভৃত পাঠক, প্রকৃত অনুরাগীরা যেমন ছাপানো বইটি হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন তেমনি সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন 'কাগজের নৌকা'র অনবদ্য ধারাবাহিকগুলির জন্য ।

শুধু ধারাবাহিক উপন্যাসই বা কেন? নানা স্বাদের কবিতা, গল্প, রম্যরচনা, কিছুই বাদ থাকছেনা এবার । ধীরে ধীরে আকারে ও প্রকারে ত্রৈমাসিক 'বাতায়নে'র মতোই অবয়ব হতে চলেছে কাগজের নৌকার ।

এদিকে দিনকয়েক হল বাংলায় বর্ষা নেমেছে । টিপটিপ থেকে ঝিরঝির হয়ে ঝমঝম ! কাদা মাঠ আর ভরা নদীর বর্ষা! মুড়ি বেগুনি আর খিচুড়ি ইলিশের বর্ষা ! এই ভরা নস্টালজিয়ার মরসুমে ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। আহা ! সেই জল থইথই রাস্তার দুর্নিবার আকর্ষণ, স্কুল থেকে ঘুরপথে বাড়ি আসা ! আরেকবার যদি ফিরে পাওয়া যেত সে দিনগুলো ..... গেছে যে দিন, সে কি একেবারেই গেছে ? কেজো পথের পাশে হঠাৎ বৃষ্টিতে যদি জল জমে, আজও তো ইচ্ছে করে ভাসিয়ে দিই একটা কাগজের নৌকা ! তাই তো আমাদের এই 'কাগজের নৌকা' । লেখক পাঠক সবার ভালোবাসার এই তরীটিকে চলুন সবাই মিলে এগিয়ে নিয়ে যাই। লেখা দিন, পড়ুন, পড়ান, পাঠ-প্রতিক্রিয়া জানান। তবেই তো আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহনের সুবাতাস আর ঢেউয়ের দোলায় একটুএকটু করে এগিয়ে যাবে কাগজের নৌকা ।

আজ আসি। সবাই ভালো থাকবেন ।

মানস ঘোষ
সম্পাদক

বাতায়ন বুলেটিন

সব দেশের আলাদা আলাদা গল্প আছে। সেখানকার মাটি, জল, আকাশের গন্ধ লেগে থাকে সেইসব গল্পে, কবিতায়, রূপকথায় . . . তাই আলাদা হয়েও কোথাও যেন মিলে যায় তারা . . . দেশ, ধর্ম, ভাষার বেড়াজাল গৌণ হয়ে যায়। সাহিত্যের সুবাতাসে জেগে থাকা রূপকথারা ভেসে বেড়ায় বাতায়ন থেকে বাতায়নে . . . তাই ভালো লাগে যখন দেখি, কলকাতা প্রেস ক্লাবে বাতায়নের বার্ষিক সংকলনের আবরণ উন্মোচন করার সময় অস্ট্রেলিয়ান কনসাল জেনারেল Mr. Andrew Ford অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের এই শুভ উদ্যোগের। তিনি এবং কলকাতা পাবলিশার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মঞ্চ থেকেই জানিয়ে দিলেন, 'বাতায়নে'র পাশে থাকার বার্তা। পার্থ, কলকাতা, সিডনী, হাওড়া, ক্যানবেরা, শিকাগো, পৃথিবীর বিভিন্ন নানা শহর থেকে জড় হওয়া বাতায়ন পরিবারের সদস্যদের ও কর্ণধার অনুশ্রীদির মুখে তখন রামধনুর আলো। প্রার্থনা করি এই রামধনু রঙের স্বপ্ন নিয়েই বাতায়ন যেন এগিয়ে যেতে পারে তার সাংস্কৃতিক বিশ্বপরিক্রমায় !

পুনশ্চ :

- পুরো অনুষ্ঠানটি দুর্দান্ত সঞ্চালনা করেছেন বালার্ক ব্যানার্জী।
- এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের সিংহভাগ কৃতিত্ব দিতে চাই বাতায়নের মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর বিশ্বজিৎ মতিলাল কে।
- বাতায়ন বাংলা বিভাগের সম্পাদিকা রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় সুদূর শিকাগো থেকে এলেন, বললেন, জয় করলেন। তাঁর মনোজ্ঞ বক্তব্যও উজ্জ্বল উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন !
- কাগজের নৌকার সম্পাদক ও বাতায়নের কলকাতা বিভাগের সংযোজক মানস ঘোষের সুচিন্তিত ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সহযোগিতা অনুষ্ঠানকে এক বিশেষ মাত্রা দিয়েছিল । মানসবাবুকে বাতায়নের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ।
- আমাদের সবার দাদা, তীর্থঙ্কর ব্যানার্জীর উষ্ণ সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।
- সৌমিত্র চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ দে (সুদূর ক্যানবেরা থেকে), স্বর্নালী, স্নেহাশিস আর শেষবেলায় আসা কবি তন্ময় চক্রবর্তীর ঝলমলে উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে আরো প্রাণবন্ত ও স্মরণীয় করে রাখল। তাঁদেরকে অনেক ধন্যবাদ!
- উপস্থিত থাকার জন্য মিডিয়ার অতিথিদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজ সকাল থেকে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় এই অনুষ্ঠানের খবর প্রকাশ হয়েছে – তাই আরো একবার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

PRESS RELEASE

The Statesman | Kolkata Notebook | Pg-15

Echoes from Australia

That there is a bit of Bengal in all corners of the globe was confirmed last week when the Australian Consul-General, Mr Andrew Ford, launched a special print issue of the Perth-based literary magazine *Batayan* in Kolkata. The magazine is essentially an on-line bilingual publication that has sustained the roots of a cultural bond that has grown stronger as the magazine has made use of both print and digital platforms. It has raised the level of awareness of Australia through an exciting collection of artworks, stories from the Torres Strait Islands and experiences of artists and authors with whom readers in Kolkata may well find creative bonds. The good news for the organisers was that Australia would be allotted a complimentary stall at the next book fair in Kolkata where *Batayan* would be available. That will hopefully expand the base of enthusiastic readers and contributors with the addition of a monthly on-line publication, *Kagajer Nauka* and an English edition of the quarterly magazine. The response now extends from Kolkata to other Indian cities as well as Bangladesh. But Kolkata is clearly the natural choice for launching a special edition and mingling with the literary fraternity.

MILLENNIUM POST | Kolkata | Thursday, 1 August, 2019

Page 2

BATAYAN'S PRINT EDITION LAUNCHED

The Australian Consul-General, Andrew Ford, launched a special print issue of 'Batayan', the on-line bi-lingual (English-Bengali) magazine, in Kolkata on July 31, 2019. Ford dwelt on the India-Australia cultural ties and the positive role that Batayan has been playing to strengthen this relationship. The event, supported by Dr Milan Bhattacharjee of Banga Sanskriti Australia Inc, Canberra, was attended by Tridib Chattopadhyay, Secretary, Booksellers' and Publishers' Guild, and eminent writers of Bengal and participants from Australia and the USA.

The Times of India, Kolkata
Monday, August 5, 2019 P4

Pics: Debdatta Bhowmick, Arunava Roy

CITY LIGHTS

Anglo-Indian Day

Hundreds of Anglo Indian families descended on the Maidan tent on Sunday to bring to an end the week-long festivities to celebrate Anglo-Indian Day, which is observed on August 2. The festivities were

A lunch was hosted on Sunday at the Calcutta Rangers Club to mark the end of week-long Anglo-Indian Day celebrations

hosted by Calcutta Rangers Club, the only Anglo-Indian club in the country. The final Sunday lunch has always been a favourite with the community that sets aside everything for the grand assembly over food, drinks, games, music and dance. Food was the focus of the celebrations as only home-cooked Anglo-Indian favourites were served. Members like Raymond Blaquiere, Veronica Pachico, Rita Fernandes and Cheryl Rodrigues cooked and brought favourites like chicken panthras, tongue roast, pork and beef cocktail, beef shami kebab and pork roast to be served at the lunch. "We celebrate like no one else does. We eat, drink, play music and dance till the night fades into dawn," said former president of the club Norman Knight. "Anglo-Indians are humanitarians first. To us all religions are same and these barriers don't matter," said Peter Remedios, another ex-president. Present president of the club and Anglo-Indian MLA Shane Calvert asserted that the community was also known for sporting activities like cricket, football and hockey league matches on the Maidan every season.

Celebrating EB centenary

Mukhopadhyay is also the president of JUEBFG, which comprises students, research scholars, faculty members, non-teaching staff and alumni. The programme concluded with a five-a-side exhibition match.

Boost to Indo-Aussie ties

Online bilingual (English-Bengali) magazine 'Batayan' launched a special print issue on July 31, which was released by Australian consul general in Kolkata Andrew Ford. The consul general said Batayan was helping improve Indo-Australian ties. Ford added that the 'Batayan' implied a window to the world and the magazine aimed to focus on the indigenous Australian culture for readers across the globe, particularly in Bengal. Batayan, which has its roots in Perth, was conceived by Anusri Banerjee. It also features novels, stories and poems. Author Tridib Chatterjee was present at the launch.

Australian consul general Andrew Ford launches the special print issue of 'Batayan' at Press Club on July 31

Tiger talks

The session started with talks about the elusive Sunderbans tiger and went beyond its charisma to focus on its habitat and the impact of climate change on it. City-based NGO Natu-

Kolkata, and Kailash Chandra, director, Zoological Survey of India, launched awareness posters to mark the occasion. Among the speakers were former chief wildlife warden of Bengal Pradeep Vyas, director of Sunderbans Biosphere Reserve S Kulandaivel, and tiger researcher Sujeet Kumar Singh of ZSI. Monica Shea, director of American Center, Kolkata, was also present.

Overcoming challenges

A fundraiser was organized at a sports bar in Salt Lake, Sector 5, on Friday to support the national and international para-athletes in Bengal. Rock band 'The Grooverz' performed for the cause as only 30 tickets could be sold for the event. Lead singer Kaustav Banerjee said, "Only God can help those who are not interested in these inspi-

ring para-athletes." Around Rs 50,000 was raised, of which Rs 35,000 was handed over to three athletes — blind cricketer Harilal Tudu, Para Volley player Sahir Ali and international swimmer Anamika Gorai. "This is the first time I got some monetary help. I am thankful to Civilian Welfare Foundation for arranging this fundraiser," Gorai said.

Save green, stay clean

Doctors, nurses and other staffers of Cal-

day to increase the green cover on campus.

Talk on Vidyasagar

The Vidyasagar Charcha O Gabeshana Kendra observed the 129th death anniversary of Vidyasagar at the 132 year old Bauddha Dharmankur Sabha on July 29. This year assumes significance because the city is celebrating his birth bicentenary. The theme of the discussion on July 29 was 'Vidyasagar's Thoughts on Health and Treatment', in which general secretary of the Sabha Bhikkhu Bodhipala spoke about why Vidyasagar's ideas are timeless. Among the speakers were former MP and member of the parliamentary standing committee on health Tarun Kumar Mandal, director of Calcutta Heart Clinic and Hospital Ashok Kumar Samanta, secretary of Medical Service Centre Angsuman Mitra, former curator of Rabindra Bharati Museum Indrani Ghosh and president of Bauddha Dharmankur Sabha Hemendu Bikash Chowdhury.

Monsoon calling

ICCR, in collaboration with Twins Tour, organized a Cultural Evening, 'Monsoon Calling', on July 27 at Rash Bari Garden House. Several diplomats, including Consul General of Japan Taga, deputy Consul General of Germany Schrod, consular officer Daniel Wilson from American Consulate and IFS (retd) Saravjit Chakroborty, deputy director of Alliance Françoise Tiphane Mayran, attended the programme. The main attractions of the event were performances by Indian classical violinist Ustad Johar Ali Khan and renowned folk music artist Dipannita Acharya.

Tribute to Dwarakanath

Rabindra Bharati University (RBU), Indian National Trust for Art and Cultural Heritage and the Bengal Chamber of Com-

Scanned with CS

#কলকাতা

Home | Entertainment | Sports | Viral

Posted at Date: August 01, 2019

Posted by : Sandeep Dutta

Contact No. : 9830378489

Launch of the special issue of Batayan,

Launch of the special issue of Batayan, the on-line bi-lingual (English-Bengali) magazine, by the Australian Consul-General, Mr Andrew Ford, on Wednesday, at Press Club, Kolkata.

The event is supported by Dr. Milan Bhattacharjee of Bongo Sanskriti Australia Inc, Canberra, along with eminent writers of Bengal and participants from Australia and the USA. Shri Tridib Chattopadhyay, Secretary, Book-Sellers and Publishers Guild, has consented to be present.

Batayan was conceived by Dr. Anusri Banerjee. With its roots in Perth, it has branched out to all over Australia and then to Chicago and other cities in the USA and Europe. It is blessed with the backing of its growing base of enthusiastic readers and contributors. Batayan has also expanded its reach in the subcontinent to include Kolkata and other cities in India and Bangladesh. Batayan was fortunate to get the Inspiration and blessings of the legendary poet Shankha Ghosh

Sanbad Pratidin 1.8.19 P:12

প্রকাশিত হল নতুন পত্রিকা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রকাশ পেল নতুন দ্বিভাষিক পত্রিকা 'বাতায়ন'। বুধবার অস্ট্রেলিয়ার কনসাল জেনারেল অ্যান্ড্রু ফোর্ডের হাত ধরে প্রকাশিত হল এই পত্রিকা। বাংলায় বাতায়ন শব্দের অর্থ জানালা। ভারত-অস্ট্রেলিয়ার সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন ফোর্ড। ফোর্ড জানিয়েছেন, এই পত্রিকার মাধ্যমেই অস্ট্রেলিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছুঁয়ে দেখতে পারবে বাংলা। টরেস স্ট্রেট আইল্যান্ডের শিল্পী-লেখকদের সৃজনশীলতার নমুনার দেখা মিলবে এই পত্রিকায়। পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, ড. মিলন ভট্টাচার্য-সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

বুধবার প্রেসক্লাবে অনলাইন ম্যাগাজিন 'বাতায়ন'-এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করছেন অস্ট্রেলিয়ার কনসাল জেনারেল অ্যান্ড্রু ফোর্ড।

প্রবাসী বাঙালিদের অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা 'বাতায়ন'

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা, ৩১ জুলাই– অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী বাঙালিদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত দ্বিভাষিক পত্রিকা 'বাতায়ন'। মঙ্গলবার প্রেস ক্লাবে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন অস্ট্রেলিয়ার কনসাল জেনারেল অ্যান্ড্রু ফোর্ড।

দীর্ঘ দু'দশক ধরে অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরে বাস করেন ড. অনুশ্রী ব্যানার্জি, 'বাতায়ন' তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। 'দুনিয়াজুড়েই বাঙালিরা ছড়িয়ে আছে। আমরা চেয়েছি অনলাইন পত্রিকার পাশাপাশি কাগজ সংস্করণ প্রকাশ করে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে সংস্কৃতি চর্চা, সাহিত্য চর্চার প্রসার ঘটাতে', বলেছেন অনুশ্রী। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, ক্যানবেরা বা পার্থ শহরের পাশাপাশি আমেরিকার শিকাগোতেও ছড়িয়ে পড়েছে 'বাতায়ন'। পত্রিকাটির বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ার কনসাল জেনারেল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন 'পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড'র সভাপতি ত্রিদিব চ্যাটার্জি। কলকাতা বইমেলায় অস্ট্রেলিয়ার জন্য বিশেষ স্টল এবং সেই স্টলে 'বাতায়ন' পত্রিকাকেও পরিসর দেওয়া হবে, এদিন ঘোষণা করেন ত্রিদিব চ্যাটার্জি।

Ganashakti | Pg-2 | 1 August 2019

Dainik Viswamitra 1.8.19 P:4

आस्ट्रेलिया के कौंसुल जनरल एण्डू फोर्ड 'वातायन' के विशेष मुद्रित संस्करण को जारी करते हुए। वातायन का यह संस्करण अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में है। यह एक ऑनलाइन पत्रिका है। विश्वमित्र

Rajasthan Patrika 1.8.19 P:5

लॉच किया बतायन पत्रिका का विशेष अंक

कोलकाता. आस्ट्रेलियन कौंसुल जनरल एन्ड्रु फोर्ट ने बुधवार को आन लाइन द्विभाषी पत्रिका बातायन के विशेष अंक का लोकार्पण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि बांग्ला और अंग्रेजी भाषा की इस पत्रिका के माध्यम से दो देशों के बीच के संस्कार, सभ्यता और आपसी सौहाद का आदान-प्रदान के साथ ही आपसी संबंध भी मजबूत होगा। इस मौके पर डॉ. मिलन भट्टाचार्य, त्रिदीब चट्टोपाध्याय आदि की उपस्थिति रही। इस पत्रिका के माध्यम से दोनों देशों के बीच के संस्कृति को जानने समझने का माध्यम बनकर उभर रहा है। संबंधों को मजबूत करने के लिए यह अहम कड़ी है।

पत्रिका Thu, 01 August 2019
epaper.patrika.com/c/42027551

Aajkal 1.8.2019 P:8

বাতায়ন অনলাইন

'বাতায়ন' পত্রিকার বিশেষ সংস্করণের প্রকাশ করলেন কলকাতার অস্ট্রেলিয়ান কনসাল জেনারেল অ্যান্ড্রু ফোর্ড। বুধবার বাংলা ও ইংরেজি, দুটি ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছে মূলত অনলাইন পত্রিকার এই সংস্করণটি। অস্ট্রেলিয়ার সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় রয়েছে পত্রিকায়। অনুষ্ঠানে ছিলেন বুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ডের সম্পাদক ত্রিদিব চ্যাটার্জি, বিশ্বজিৎ মতিলাল, অনুশ্রী ব্যানার্জি প্রমুখ।

সূচীপত্র

ধারাবাহিক উপন্যাস

নবকুমার বসু	হটাবাহার	16
সৌমিত্র চক্রবর্তী	সময়	31

ধারাবাহিক গল্প

রমা জোয়ারদার	চা-ঘর	23

রম্যরচনা

স্বর্ভানু সান্যাল	লাইকলাভ	35

কবিতা

যশোধরা রায়চৌধুরী	বাংলা ভাষার কবিতা	11
	ফেডেড জিনস	11
পল্লববরন পাল	সনেটগুচ্ছ	12
মৌসুমী রায়	কোলাজ	13
অপর্ণা বেরা	স্রোডিঞ্জারের বিড়াল	14
সঞ্জয় চক্রবর্তী	না বলা কথার বিকেল	15

গল্প

পবিত্র চক্রবর্তী	ডায়েরীর পাতায় ট্যানিফ্লোরাম রোডিওলা	37

প্রবন্ধ

জয়দেব সাহা ও রুবাইয়া জেসমিন (জুঁই)	বিশ্বকবির বন্দনায় কার রূপ ? সে তো ঈশ্বর নয় !	42

বইপাড়া 46

যশোধরা রায়চৌধুরী

বাংলা ভাষার কবিতা

অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বেড়ে উঠছে আমার ছাওয়াল
হিন্দি ইংরিজি খেয়ে বেড়ে উঠছে আমার কবিতা
ফ্যানফ্যান ফেনিয়ে উঠছে, পুষ্টিকর আমার বাচন
ছেঁড়া ছাঁট শব্দ খেয়ে ফনফনিয়ে উঠছে চারালতা
আকথা কুকথা খেয়ে বেড়ে উঠছে আমার বিবৃতি
বাংলাভাষা বাংলাভাষা, মায়াছাওয়া হারানো নিভৃতি।

ফেডেড জিনস

এত প্রিয়, ছিঁড়ে যাও, তবু ছাড়া যায় না তোমাকে
এত প্রিয়, ঘষা লেগে ঝুলে পড়ে আলগা হয়ে সুতো
তুমি সেই জিনপ্যান্ট। তুমি সেই ক্রমবিবর্তন
পায়ের চামড়ার সঙ্গে লেপ্টে থাকা, কৈশোরের রোম
যেভাবে ক্রমশ বাড়ে, ক্রমশ পুরুষ হয়ে ওঠে
সেভাবেই জিনস তুমি প্রিয় হও, ক্রমশ পুরুষ
সুতোগুলো সফট হল, যেন দাড়ি, যেন মিঠে কড়া
খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গোঁফ, সাবানে নরম হও, সাবানের ফেনায় ফেনায়
ক্রমশ ধূসর হয় নীল
আহা তারপর সেই মায়াবী মঞ্জিল
হালকা ছায়ার মত দূর থেকে ডাকে, হাতছানি দেয় শুধু
পাথরে পাথর ঘষে চকমকি খেলে
আগুনের অপেক্ষায় থেকে থেকে থেকে
ছেলেরা, ফেডেড জিনস, ধুয়ে যায় নোনতা জলীয়ে...

যশোধরা রায়চৌধুরী — বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য কবি এবং গল্পকার। তার লেখা তেরোটি কাব্য আর ছয়টি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। লেখার জন্য ১৯৯৮ সালে কৃত্তিবাস পুরস্কার ও বাংলা অ্যাকাডেমীর অনিতা সুনীলকুমার পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তার গল্প ও কবিতার বইয়ের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য — পণ্যসংহিতা, পিশাচিনি কাব্য চিরন্তন গল্পমালা, মাতৃভূমি বাম্পার, ভবদেহে স্বর্গীয় সঙ্গীত ইত্যাদি। যশোধরা ফরাসী থেকে বাংলাতেও অনুবাদ করেছেন।

পল্লববরন পাল

সনেটগুচ্ছ

সনেট ১৬

কবিতা লেখেনা কবি, আসলে সে নারী
স্বপ্ননীল রং মেখে কলম শিখরে
শব্দ আর অক্ষরের বৃষ্টি হয়ে ঝরে
অবশ্য কবিও নয় অবিমৃশ্যকারী –
খাতার পাতায় সেই শব্দ দিয়ে গড়ে
নারীর আয়ত চোখ, প্রতিটি ভঙ্গিমা
তীক্ষ্ণ অক্ষরের ভাঁজে শরীরের সীমা
তাকে নিয়ে যাত্রা করে অনন্ত সফরে

পালিও জানেনা ঠিক কখন কিভাবে
হিমবাহ থেকে নামে পবিত্র প্রণালী
ভেজায় শহরটাকে সহজ স্বভাবে ।
কবিতা সবুজ হলো ।

সেই থেকে পালি
আদিগন্ত ভালোবেসে এই কলকাতা
নিজেই নিজের লেখা কবিতার খাতা

সনেট ১৭

বিছানায় কেন এতো ছড়ানো অক্ষর ?
এ মন্দা বাজারে করো অপচয় রোধ
বরং কবিতা লেখো – যুগপৎ বোধ
শব্দের ইমারতে লক্ষ লক্ষ
জীবনে আসুক শান্তি । এই বিছানায়
অক্ষরের গর্ভপাতে রক্ত আছে লেগে
শব্দ ও বোধের ঘ্রাণ ইতস্তত জেগে
যুদ্ধ শেষ – শান্তিজল কানায় কানায়
বিছানার মাটি জুড়ে ফলায় ফসল
সুখের ব্যথায় কাঁদে পোয়াতি বিছানা
নবজাত কবিতার প্রথম গোসল
এই বিছানায় – তাই শব্দ দেয় হানা

পালির বিছানা জুড়ে কবিতার খাতা
অক্ষরের শব্দে শব্দে বিমূর্ত বিধাতা

কর্মসূত্রে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের মাস্কাট শহরে একটি নামী বহুজাতিক কন্‌সাল্‌টেন্সি কোম্পানির চিফ্ আর্কিটেক্ট, আর মর্মসূত্রে আগাপাশতলা এক বামপন্থী বিষণ্ন কবি – প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫ – যার মধ্যে আছে দুটি উপন্যাস – একটি গদ্য, একটি পদ্যে লেখা । গান, ছবি আঁকা, আর পড়াশোনা – খুব কাছের বন্ধু এই তিনজন ।

মৌসুমী রায়

কোলাজ

ভালোবাসা ....

সেকি ফুলের শয্যা, শুধুই বিলাসে বিভোর?

নাকি অব্যক্ত যত যন্ত্রণাকথা

ভিজে বালিশের বাহুডোর ....

পূর্ণতা তার প্রেমে না বিরহে,

অঙ্গীকারের ছায়াপথ বেয়ে,

অনুভবে যার কেঁপে ওঠে

ঠোঁট,

অশ্রু সজল আঁখি,

হৃদয় গভীরে হাজার কথার জটিল আঁকিবুঁকি।

হয়তো সবটা সত্যি নয়,

নিছকই কবির কল্পনা ....

বেদনার রঙে প্রেমের তুলিতে

এলোমেলো ছবি আঁকি !

মৌসুমী রায় – সেবায় ও পালনে, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত গৃহবধূ। যৎসামান্য অবকাশের আকাশে রামধনুর খোঁজ, কবিতা লেখায়, সাহিত্য পাঠে। পাঠকের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর লাদাখ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। উপরি পাওনা প্রাঞ্জল গদ্য আর কিছু নয়নাভিরাম ছবি।

অপর্ণা বেরা

স্রোডিঞ্জারের বিড়াল (Schrodinger's Cat)

বিড়ালটা বেঁচে আছে, মরেও গেছে;
দেখবে খুলে খাঁচাটা ?

সেই সন্ধ্যায় জোড়ালো আলোয় যুক্তির আশ্লেষ –
পরশুরামের কুঠার – তোমার নাগরিক বাধ্যতা,
ঘণ্টা দুয়েক অবধি বিচ্যুতি, আর নীরব যন্ত্রণা –
বিভ্রান্ত না ভণ্ড; অভ্যস্ত নাকি আপোশ - - ?
দেখতে দেখতে - - ভাবতে ভাবতে -
মাকড়সার জালের মত কুয়াশারা ঝোলে; অবহেলে ।

তারপর রাত বাড়ল – অভাব থেকে স্ব-ভাবে;
শহর জুড়ে শুধু মিছিল – ভিড় – মানুষ নেই –
তারা সব আগুনের ওপর টান টান শিকে গাঁথা;
কেউ চেয়েছিল বৃষ্টি হতে; কেউ রোদ্দুর
এখন সবাই বারবিকিউ – কাবাব – তন্দুর ।

শেষ রাতে অতল আদিম সংঘর্ষ
আলোর বেগে ঈশ্বরকণা - - গর্ভাধানে ;
রক্তস্রোতে - - সপ্তাশ্বরথে - -
আত্মজ না অমর্ত্য, অপরা না ব্রহ্ম
উত্তরটা অনিশ্চিত - - - বিড়ালটাও ।

অপর্ণা বেরা ভূগোলের অধ্যাপিকা । নিভৃত কাব্যচর্চাই তাঁর বেশি পছন্দ । তবে ইদানিং গুণমুগ্ধদের অনুরোধে কিছু পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ এবং বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ । সম্ভাবনাময় এই কবিকে বাতায়নে স্বাগত ।

সঞ্জয় চক্রবর্তী

না বলা কথার বিকেল

কুয়াশা বিকেল, সোনাগলা রোদ,
পাতা ঝরে পড়া শীতে,
টুপটাপ কথা জড়ো হয়ে যায়
এমনিতে ওমনিতে ।
ভীড়ে মেশে তারা একে অন্যেতে,
শুধু কাকে যেন খুঁজি,
কিছু কথা যারা চুপ রয়ে গেছে
আলগোছে আজ বুঝি ?
সেই কিছু ? যারা পেরোতে পারেনি
হাজার যোজন দূর,
পড়ে থাকে কিছু ছেঁড়াখোঁড়া স্মৃতি,
বিকেলের রোদ্দুর ।
বিগতের দিন, ফেরানো কঠিন,
কিছু কথা ফেরে মনে,
অতীতের ধুলো আজো মেখে তারা
পড়ে থাকে এক কোণে ।
সরানো কি যায়? তাই সরে যাই,
সময়ের সাথে সাথে,
তবু ফেরে স্মৃতি, তারাদের মত
প্রতিবারে প্রতিরাতে ।
আজ দুই হাত ধরে কখনো বা
দেখে যেতে পারো শেষে,
খোলা দুই মুঠো, দিয়ে গেছি সব
ভালবেসে অক্লেশে ।
যদি পারা যেত বিকেলের রোদে
পিছুটানে ফিরে আসা ?
থাকে আজো জানো, তোমার জন্য
.... অফুরান ভালোবাসা ॥

সঞ্জয় চক্রবর্তী অধুনা সিডনী নিবাসী । পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কবিতাপ্রেমিক । ছন্দ তার কবিতায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে । ফেসবুকিয় জগতে অনেক দিন ধরে টুকিটাকি লেখার পর অবশেষে বাতায়নে আত্মপ্রকাশ । সঞ্জয়ের সব থেকে বড় দুর্বলতা হল মেঘ আর বৃষ্টি ।

নবকুমার বসু

হটাবাহার

পর্ব ৮

(১৪)

কোর্ট রুমের গ্যালারিতে গাদাগাদা লোকের মধ্যে সুদীপাও বসেছিলেন। তাঁর ডান দিকে সুরূপা; বাঁ দিকে মাইতিও বসেছিল, কিন্তু কটা নাগাদ কেস উঠতে পারে, জাজ, কখন আসবেন . . . ইত্যাদি খবর নেওয়ার জন্য একটু আগেই ও 'আসছি' বসে উঠে গেল। যথারীতি সিঁড়ির পাশে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লোক এসে বসে পড়েছে সুদীপার পাশে। সুদীপা স্মরণ করিয়ে দেওয়া মাত্র মাঝবয়সী গ্রাম্য লোকটি বললেন, জানি দিদি . . . এখানটা আপনার ভাই বসেছিলেন।

সুদীপা বললেন, ও এখনই আবার ফিরে আসবে।

আসুন না . . . ঠিক আছে। আমি জায়গা ছেড়ে দেব। কটায় আপনাদের কেস ?

কথা তো আছে আড়াইটেয় . . . তারপর কখন হয় . . . সেই খোঁজখবর নিতেই গেছে।

লোকটি যেন কথা চালাবার জন্যই বলল, দেখুন . . . শেষপর্যন্ত যদি হয়ে যায় তাহলেই ভাল।

সুদীপা ভদ্রতা দেখানর মতো বললেন, আপনারও কেস আছে নাকি আজ ?

লোকটি শ্বাস ফেলে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই বোশেখ মাস থেকে আরও তিনবার ডেট পড়েছিল। সুদীপা আলতো ভাবে বাঁদিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন লোকটিকে। মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি আর পাজামা পরা, চোখে চশমা, পায়ে চপ্পল। জিগ্যেস করলেন, কেস হল না কেন ?

প্রথমবার সময়ে কুলোল না। দ্বিতীয়বার জাজ্ আসেন নি। তৃতীয়বার অপোনেন্ট-এর উকিল এ্যাপিয়ার না-হয়ে পিটিশন জমা দিল জুনিয়রকে দিয়ে, যাতে পরে ডেট দেওয়া হয় . . . জাজ এ্যালাউ করে দিলেন।

আজকে হবে ?

কথা আছে দিদি . . . হলে হবে। নইলে আবার ডেট পড়বে . . . জানি না শেষপর্যন্ত কেস চালাতে পারব কিনা . . . সেই ঘুটিয়ারি শরিফ থেকে আমি দোকান বন্ধ করে . . . উকিলের দক্ষিণা তো দিতেই হয় . . . । জান কবুল করে লড়ছি এখনও। পুরো ঘরটার চেহারা দেখে সুদীপার বহুদিন আগেকার কলেজের তথা য়্যুনিভার্সিটির লেকচার-থিয়েটার-এর কথা মনে পড়ছিল। এইরকমই ধাপে-ধাপে চওড়া সিঁড়ির ওপর বসানো গ্যালারি। সেখানে অবশ্য মিশ্র জনসাধারণের এমন থিকথিকে ভিড় থাকতো না। এখানে একেবারে সামনে নিচের দিকে কাঠের প্ল্যাটফর্ম। তারওপর বিচারকের চেয়ার-টেবিল। তার পাশে জাজ-এর সহকারি-পেসকার-ক্লার্ক ইত্যাদি। সামনে নিচের দিকে প্রথম সারিতে বাদি এবং বিবাদি পক্ষের উকিলরা লাইন দিয়ে বসে আছেন। একের পর এক একাধিক কেস হবে। উকিলদের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য শুনেই বিচারক তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। প্রয়োজনে উকিলদের প্রশ্ন করবেন, মন্তব্যের ব্যাখ্যাও চাইতে পারেন, সাক্ষীদের বক্তব্যও। শুনবেন। আশা করা যায়, যে-কটি কেস সেই বিশেষ দিনে, উঠবে। বিচারক মহাশয় আগে থাকতেই তার খুঁটিনাটি পড়ে এবং জেনে নিয়েছেন। সুতরাং আশা করা যায় সওয়ালপর্ব শেষ হওয়ার পরে, কিছু রায়-ও দেবেন। তাইতে কেস-এর নিস্পত্তি হয়ে যেতে পারে, না-ও পারে। সুতরাং এই কোর্টরুমে একটি উদ্বেগ এবং অনিশ্চয়তার মন নিয়েই বসে আছেন সবাই।

লোকটি সুদীপার দিকে কিঞ্চিৎ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, দিদিমনির কি আজ প্রথমবার ডেট পড়েছে ? সুদীপা বললেন, আগেও পড়েছিল . . . আমি দেশে ছিলাম না, সেইজন্য পিছোতে হয়েছিল . . . ।

লোকটি বলল, দ্যাখেন . . . আল্লার দোয়ায় যদি একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যায় . . . । এ যে কী ফ্যাস্তাকল-এর জায়গা . . . !

গ্যালারির ওপর থেকে সুদীপার চোখে পড়ল, ছোটখাট চেহারার মাইতি ফিরে আসছে।

সুরূপা পাশ থেকে জিগ্যেস করল, দিদিভাই . . . তোমার সেই উকিলকে তো দেখছি না এখনও !

সুদীপা মাথা নাড়লেন। — দেখি মাইতি কী বলে।

মাইতি পৌঁছতেই লোকটি আর একটু বাঁদিকে সরে গেল। জায়গা থাকায় অসুবিধে হল না। মাইতি সুদীপার পাশে বসে বেশ একটু তুষ্টির ভাব করেই বলল, কেসটা আজই হবে দীপাদি . . . হয়তো চারটে বেজে যাবে হতে হতে . . . কিন্তু অপূর্বদা থাকতে বলেছেন। সুদীপা বললেন, এমনিতে তো আমাদের থাকার কোনো দরকার নেই . . . তাই না ?

সেটা অবশ্য . . . তবে আর্গুমেন্টটা তো শুনতে হবে . . . তারপর কী ভার্ডিক্ট দেয় জাজ . . . !

মিস্টার মল্লিক কী বলছেন . . . ভার্ডিক্ট কোনদিকে যাবে ?

আপনি চিন্তা করবেন না দীপাদি . . . অপূর্বদা সত্যেন বাগচি বলে আর একজন এ্যাডভোকেটকেও নিয়েছে আজ . . . । সুদীপা আর কোনো মন্তব্য করলেন না। খেয়াল করলেন ডানদিকে বসা রূপা মোবাইল ফোনে চাপা গলায় চঞ্চলকে খবরটা জানিয়ে, ফিরতে দেরি হবে সেটাও বলে দিল।

ঘরের মধ্যে মিশ্র কণ্ঠস্বরের একটি ধারাবাহিক গুঞ্জন ভেসে বেড়াচ্ছে, মাঝেমাঝে তারমধ্যেই নিচের মঞ্চ থেকে একটি উচ্চকিত এবং বাজখাঁই গলা কোনো নাম ধরে ডাকছে . . . সম্ভবত সাক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। পুরনো দিনের বিশাল ঘরটির ছাদ অনেক উঁচু। সেখানে কড়ি বরগা থেকে লম্বা রডের শেষপ্রান্তে তিন ব্লেডের পাখা ঘুরছে। তাসত্ত্বেও ভ্যাপসা গরম ঘরের মধ্যে।

মঞ্চের ওপর একের পর এক কেস্ হয়ে চলেছে। একজন বিচারকের এজলাস শেষ হয়ে গেলে আর একজন আসছেন। তার মধ্যেই উকিলদের ঝগড়াঝাঁটি, তর্ক, সাক্ষীকে জেরা . . . সঙ্গে কিছু ঠাট্টা তামাশা . . . তাও চলছে। লোকজনের ঢোকা-বেরুনোর বিরাম নেই, যদিও দরজার মুখে একজন বন্দুকধারী পেয়াদা বা দারোয়ানও হাস্যকরভাবে উর্দি পরে দাঁড়িয়ে আছে। সিনেমার কোর্টরুম আর বাস্তবের চেহারায় কত তফাৎ ! এই প্রাগৈতিহাসিক পরিবেশে কি করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার এবং রায় দান সম্ভব, সুদীপা ভাববার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভেবে লাভ নেই, কেননা, যস্মিন দেশে যদাচার। নিজেকে যথাসম্ভব নিরুদ্বেগ রাখার চেষ্টা করে চুপচাপ বসে রইলেন।

দেখতে-দেখতে প্রায় মাসখানেক হতে চলল সুদীপা এবার কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন।

মনে আছে, জুলাইমাসের তৃতীয় সপ্তাহে তখন বিমানবন্দরের বাইরে এসেই যেন একটা ঝাঁকানি খেয়েছিলেন সুদীপা। ভ্যাপসা গরমের ভাপ এসে লেগেছিল চোখেমুখে। ফিসফিসিয়ে বৃষ্টি পড়ছিল, তাসত্ত্বেও ভীষণ গরম। বেলা সাড়ে-নটা-দশটা হবে। আকাশে হালকা মেঘ। সুরূপা গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল দিদিভাইকে তুলে আনতে। ড্রাইভার পার্কিং থেকে গাড়ি নিয়ে আসতে আসতে সুদীপা ঘেমে একসা হয়ে গিয়েছিলেন। দেশের বর্ষাকাল এবং গুমোট গরমের অভিজ্ঞতা নেই অনেকদিন। ব্যাপারটা যে এতোখানি কষ্টকর হবে আগে থেকে অনুমান করেন নি।

গাড়ি আসামাত্র ভেতরে এসি-তে বসে যেন দম ফেলেছিলেন সুদীপা।

প্রশান্ত নামের সেই আগের ড্রাইভার ছেলেটাই সুদীপার সুটকেস, হ্যান্ডব্যাগ তুলে দিয়ে দ্রুত রওনা হয়ে গিয়েছিল। সুরূপারও গরম লাগছিল, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই ওর অবস্থা দিদিভাইয়ের মতো না। সীটে বসেই বলেছিল, এই সময়টা গরমে-ঘামে আমাদেরই জীবন বেরিয়ে যায় . . . তুমি কি করে থাকবে দিদিভাই।

সুদীপা বললেন, থাকতে যখন হবে . . . আর উপায় কী ! অভ্যাসও হয়ে যাবে। তোরাও তো রয়েছিস।

আমরা না থেকে কোথায় যাব দিদিভাই . . . অলটারনেটিভ তো নেই !

সুদীপা হালকা হেসে বললেন, নারে . . . নিজের দেশের কি কোনো অলটারনেটিভ হয় !

দ্যাখো . . . ওই সেন্টিমেন্ট্ কতদিন ধরে রাখতে পারো . . . । যাইহোক, আগে তোমার সিল্ক্ উইলোরির কথা বলো। রূপার আগের কথাটাই সুদীপার মাথায় কয়েকবার ঘুরে গেল। সত্যি সেন্টিমেন্টই তো ! তা নয়তো এই যে সকাল দশটার সময় এয়ারপোর্ট থেকে শহরের কেন্দ্রে যাওয়ার রাজপথের যে বিশৃংখল চেহারা, তাকি কোনও সভ্য দেশে দেখা যায় ! অথচ সবই রয়েছে। মোটামুটি চওড়া মসৃণ রাস্তা, আপ এ্যান্ড ডাউন, অনেক গাড়ি, ট্রাফিক লাইট-পুলিশ . . . কিন্তু কোনও নিয়ম, আইন-কানুন কিছু নেই। যে, যেভাবে যেখান দিয়ে পারছে গাড়ি ঢুকিয়ে দিচ্ছে, জ্যাম করে দিচ্ছে, বড় গাড়ি চোখ রাঙ্গাচ্ছে ছোটগুলোকে, ছোটগুলোর মধ্যে অটো-ঠেলা-রিকশা কাঁচা খিস্তি ছুঁড়ছে বড় গাড়ির দিকে . . . রাস্তার পাশের দিকের এক তৃতীয়াংশ দখল করে সবজী বাজার এবং প্রমোটারদের বালি-স্টোনচিপস্ . . . তার মধ্যে কাতারে কাতারে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে বাস অথবা মিনি কিংবা অটো ধরবার জন্য এবং তারা ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে যাত্রী তুলছে, যার ফলে . . . জ্যাম তৈরি হচ্ছে এবং তারই ফাঁক ফোকর গলে বাচ্চার হাত ধরে মা স্কুলের রাস্তা শর্টকাট করছে . . . ।

কী হল দিদিভাই . . . চুপ করে রয়েছো যে !

সুদীপা মাথা নাড়লেন। বললেন, নাহ্ . . . তুই সেন্টিমেন্টের কথা বললি . . . সেটাই ভাবছিলাম। যাক বাদ দে। . . . হ্যাঁ ওখানে . . . মোটামুটি সব ঠিকই আছে রে। যাওয়ার সময় নার্ভাস লাগছিল বটে . . . আর যে-ঘটনাটা হয়েছিল, সেটাও যথেষ্ট দুশ্চিন্তারই ছিল। তবে ইন্সিওরেন্স্ থাকায় খুব বেশি বিপদে পড়তে হয় নি . . . তাছাড়া পাড়ার মধ্যেই বিদিশারা থাকে বলে খুবই সুবিধে হয়েছিল। তিন সপ্তাহের আগেই সিলিং মেরামত, প্লাম্বিং-এর কাজ, পেইন্টিং . . . সব কমপ্লিট করে দিয়েছিল।

মুনিয়া-রবিন সব ঠিকঠাক আছে ?

আছে বলেই তো মনে হয় . . . নিজেদের বিষয়ে ওরা খুব একটা কিছু তো বলে না। না-বললে আমরাও বেশি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাওয়া উচিত না।

সে তো বটেই। . . . কিন্তু তুমি কিরকম এ্যাডজাস্ট করছিলে ?

এই প্রশ্নটা ভাল করেছিস রূপা।

কেন বলো তো ?

কেননা আমার এ্যাডজাস্টমেন্টটা এখন তো অন্যরকম। কারুর সঙ্গে তো নয় . . . নিজের এবং নিজের পরিস্থিতির সঙ্গে কিভাবে এবং কতটা এ্যাডজাস্ট করতে পারব, সেটাই কথা। ব্যাপারটা যেন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো . . . অর্থহীন এবং কষ্টকর। হ্যাঁ দিদিভাই . . . ঠিকই।

সেটাও আবার ওদেশে এবং কলকাতায় অনেকটা অন্যরকম।

তা তো হবেই। দু দেশের মধ্যে পরিস্থিতিরও তো অনেক তফাৎ . . . তাই না ! জীবনধারণের স্ট্রাগল্ এখানে অনেক বেশি। সুদীপা একটু চুপ করে থেকে বললেন, সেটা কিন্তু বলা মুস্কিলরে . . . হ্যাস্‌ল বা ঝামেলা যা-ই বল, সেটা খুব রিলেটিভ। তাহলেও . . . ওদেশেও তো গিয়ে দেখেছি . . . একটা ডিসিপ্লিনড্ কান্ট্রি যেন একটা ছন্দে চলে . . . সবকিছুর একটা কন্ট্রোল আছে। সেটা অনেকখানি ঠিক বলেছিস। কিন্তু আবার আমার পরিস্থিতি অনুযায়ী, ও দেশটা বড্ড নিরালা-নির্জন-নিঃসঙ্গ।

কিন্তু তোমাদের বন্ধুবান্ধব তো কম নেই ওখানেও।

তা আছে। সুদীপা হেসে বললেন, কিন্তু এখানকার মতো প্রতিদিনই উইক-এন্ড নয় ওদেশে। ইচ্ছে করলেই কারুর সঙ্গে খানিকক্ষণ আড্ডা দিতে যাওয়া, কিংবা দেখা করতে যাওয়া সম্ভব না। আবহাওয়া যখন খারাপ হতে শুরু করে . . .

সুদীপার কথা মাঝপথেই বন্ধ হয়ে গেল এবং খানিকটা সিঁটিয়ে সরে আসার মতো ডানদিকের জানলার কাছ থেকে ছিটকে সুরূপার দিকে সরে গেলেন। ব্যাপারটা কিছু বলার আগেই বোঝা গেল কী হয়েছে। ওদের গাড়ির পাশ দিয়েই আর একটি কোনও উঁচু গাড়ি ওভারটেক করে যাচ্ছিল, এবং তার জানলা থেকে জনৈক যাত্রী পান এবং পানপরাগ জাতীয় কিছু চর্বনের মুখভর্তি লালা পিচকারির মতো ফুর-র-র করে ফেলেছে। কী ভাগ্যিস গাড়ির কাচ সম্পূর্ণ বন্ধ করা ছিল, যে কারণে প্রায় আধখানা কাচ-ই শুধু লাল-পাটাকিলে রঙে রঙীন হয়ে গেছে। একটাও খোলা থাকলে এতোক্ষণে ওই লালার দুর্গন্ধ এবং বর্ণ সুদীপার জামাকাপড়েই . . .।

প্রশান্ত বুঝতে পারা মাত্র গাড়ির স্টিয়ারিং কাটাবার চেষ্টা করেছিল বাঁদিকে, কিন্তু ঝুঁকি ছিল সেদিকেও . . . সুতরাং নেহাৎ চাপা গলায় উক্ত গাড়ির যাত্রীটির উদ্দেশে তার মাকে রমণ করার ইচ্ছে জানিয়েই নিরস্ত হতে হল ওকে।

সামান্য মুখ ঘুরিয়ে জিগ্যেস করল, মাসি . . . আপনার গায়ে পড়েনি তো ?

সুদীপা নিজের জায়গায় সরে যেতে যেতে বললেন, নারে . . . কাঁচ বন্ধ তো . . . বেঁচে গেছি . . .। তুই সাবধানে চল।

সুরূপা অপদস্থ বোধ করে এমনভাবেই চুপ করে রইল যেন গাড়ির কাঁচে পান মশলার থুতু ফেলাটা ওরই দোষ। একটু পরে মাথা নেড়ে বলল, দেখলে তো দিদিভাই . . . এই হচ্ছে আমাদের সিভিক সেন্স্, কালচার . . . সভ্যতা।

বাদ দে।

আসলে কী জানো তো . . . ভদ্র-সভ্য-পরিচ্ছন্ন একটা দেশ দেখে ফেললেই মুস্কিল। তা তো ঠিকই চলছে . . . সবই মানুষের গা-সওয়া হয়ে যায়। কোনো দূষণকেই তখন আর দূষণ মনে হয় না। গাড়ির কাচ ধুয়ে ফেলার মতোই ব্যাপারটা . . .। মা কেমন আছে বল।

মার-তো এমনিতে কোনো সমস্যা নেই . . . এতোদিন ছিল না . . . শান্তামাসি, পিসিমার বাড়ি . . . বেলা মাইমাদের ওখানে কিংবা ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন, সাঁই সমিতি নিয়ে দিব্যি ছিল। ইদানীং দেখছি মা যেন বড্ড ঝিমিয়ে পড়েছে। কত বয়েস হল বলতো মা-র ? বিরাশি ?

না- না . . . মা এবার চুরাশিতে পড়বে। কিন্তু বয়েস মাকে কাবু করেনি।

জানি। রজতের মৃত্যু মা-র একটা বড় ধাক্কা।

আমাকে বলেছিল, বয়েসে ছোটদের মৃত্যু দেখা যে কী কষ্টের . . . ! তবে . . . তোমার সঙ্গে সোনাদি-অপুদের এই আচরণ . . . প্রতারণাও মাকে খুব যন্ত্রণা দিয়েছে . . . এখন দিচ্ছে . . .। প্রায়ই বলে, বোনে বোনে মামলা মোকদ্দমা . . . ভাবা যায় !

মাঝেমাঝে আমারও কেমন অবাক লাগে রে . . . মনে হয় এ কী করছি . . . !

তুমি কী করবে দিদিভাই . . . ওরা তো তোমাকে টেনে নামিয়েছে এ রাস্তায়।

কয়েক মুহূর্তের নৈঃশব্দ্য রচিত হল। গাড়ি ভি আই পি রোড ছেড়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরল। উল্টোডাঙ্গার মোড় এড়িয়ে ওই রাস্তা একেবারে ই. এম. বাইপাসে গিয়ে পড়বে। জ্যাম না-থাকায় বেশ খানিকটা এগিয়েও যাবে তাড়াতাড়ি।

সুদীপা বললেন, মার সঙ্গে ও ওরা খুব দুর্ব্যবহার করছে তাই না !

ওদের কুকীর্তির কথা শুনলে তুমি মাথার ঠিক রাখতে পারবে না।

মাইতি ফোন করে কিছু বলেছে।

সেগুলো নিশ্চয়ই ফলস্ কেস-এর কথা বলেছে। কিন্তু ওরা যে মেন্টাল টর্চার করছে . . . তা কি মাইতিদা জানে ! ইচ্ছে করে প্যাসেজের আলো নিবিয়ে রাখা, সিঁড়িতে ময়লা ফেলে রাখা . . . মাঝেমাঝেই টেলিফোনের তার কেটে দেওয়া . . . উঠোনে ঠেলা দাঁড় করিয়ে রাখা . . . এসব তো মাইতিদাও জানে না . . . । জেনেই বা কী করবে ! আর তোমাকেও ওদেশে জানানোর কোনো মানে হয় না . . . কিছু করতে পারবে না . . . অথচ টেনশন বাড়বে।

প্রশান্ত হঠাৎ যেন আর সহ্য করতে না পেরে সামনে থেকে বলে উঠল, এদের স-সব . . . বুঝলেন তো মাসি . . . গাছের সঙ্গে বেঁধে নাঙ্গা ক'রে ধোলাই দিতে হয় . . . ভাল কথায় কাজ হবে না . . . ।

সুদীপা একটু চুপ করে থেকে বললেন, ওরা বোধহয় বুঝতে পেরেছে শেষপর্যন্ত কেস-টায় ওরা হেরে যাবে। যে কারণে এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে . . . চেষ্টা করে যাচ্ছে যতরকম ঝামেলা করা যায় . . . ।

সুরূপা বলল, ভাবা যায় . . . এরা আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় . . . !

আত্মীয়-অনাত্মীয় বলে নয় রে . . . লোভ-ই মানুষকে এমন অমানুষ করে তোলে।

আমার কিন্তু তোমার জন্যও চিন্তা হয় দিদিভাই। ল এ্যান্ড অর্ডারের অবস্থা তো জানোই।

ভেবে কী লাভ বল ! যা করার সেগুলো তো করতেই হবে। . . . রজত চলে যাওয়ার পর থেকেই ভেবেছি ও দেশে আর কী নিয়ে, কি জন্য থাকব ! এখানে তো এখনও প্রায় সবাই আছে . . . সব কিছু আছে। যেভাবে সবাই আছে আমিও সেভাবেই দিব্যি থাকতে পারব। তখন তো বুঝিনি . . . কালসাপ আমি নিজেই বাড়িতে ঢুকিয়ে রেখে গেছি। . . . আর কলকাতায় ফিরে এসে যদি নিজের বাড়িতেই উঠতে না পারি . . . বিশেষ করে এখনও মা রয়েছে . . . ।

সুদীপা চুপ করে যেতেই, কিছু মনে পড়ার মতো সুরূপা বলল, আচ্ছা শোনো দিদিভাই . . . তুমি কি কখনও এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে . . . কিংবা বিক্রি ক'রে, অন্য ফ্ল্যাট কিনে সেখানে গিয়ে থাকবে . . . দরকার হলে মা-কেও সঙ্গে নিয়ে, সেরকম কিছু মাইতিদাকে বলেছিলে ?

সুদীপা অবাক হয়ে বললেন, না তো। বরং মাইতিই একদিন কিসব . . . বিক্রি-টিক্রির কথা ফোনে বলছিল মনে আছে . . . কিন্তু আমার ওসব শোনার এবং ভাববার ও সময় ছিল না তখন। তুই জিগ্যেস করছিস কেন ?

কারণ . . . মাসখানেক ধরে আমার সঙ্গে যে-কবারই মাইতিদার দেখা হয়েছে, মনে হয়েছে . . . মাইতিদা যেন নতুন করে একটা হিন্ট দিতে চাইছিল যে, তুমি হয়তো আর বেশি ঝামেলায় যেতে চাও না . . . ।

তার মানে কী ?

মানে . . . এবার কেস-টার হেস্তনেস্ত হয়ে গেলেই, তুমি ভাল ফ্ল্যাট কিনে চলে যেতে পারো . . . সেক্ষেত্রে আমিও আর তিনতলাটা রাখব কিনা . . . মানে মা-যদি তোমার সঙ্গে গিয়েই থাকে . . . ।

এসব তো ওরই সাজেশন . . . আমি কিছুই ভাবি নি।

কি সব বলছিল . . . তাহলে আবার তোমার জন্য একটা ভাল ফ্ল্যাট দেখতে হবে . . . এ বাড়িও তো অনেক পুরনো হল . . . । সুদীপা খানিকটা বিভ্রান্তর মতোই গাড়িতে যেতে যেতে সেদিন বলেছিলেন, আরে ওসব ভাবনা যদি আমার মাথায় আসতই . . . তাহলে মাইতি কেন, আগে তো তোকে আর চঞ্চলকেই বলতাম . . . ।

আমিও তো সেই কথাই ভাবছি দিদিভাই . . . । তোমার সঙ্গে যে-কবার কথা হয়েছে এবার তুমি যাওয়ার পরে, একবারও তো বেচাকেনা সংক্রান্ত কোনো কথাই হয় নি ! ওসব তোমার ভাবনায় আছে বলেও কখনও শুনি নি ।

সুদীপার মনে পড়েছিল, সেদিন বাড়ি আসার পথে রূপার কথা শুনতে শুনতে কেমন যেন একটা আতান্তরে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি । মাইতি কি তাঁদের দুজনকে দুরকম কথা বলেছে ! একটু অবাকভাবের মধ্যেই বলেছিলেন, দ্যাখ রূপা . . . এখন আমার মনে পড়ছে, মাইতি যেন ওদের সঙ্গে কী একটা কম্প্রোমাইজ-এর কথাটথাও বলছিল . . . । সুরূপা বলেছিল, ওদের সঙ্গে মানে !

মানে আবার কী ! সুদীপা বলেছিলেন, ওই যাদের নামোচ্চরণ করতে ঘেন্না করে . . . অপু, সোনাদি . . . ওদের সঙ্গে . . . ।

সুরূপা অবাক বিষয়ে একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, দিদিভাই . . . বলতে সংকোচ হচ্ছে . . . কিন্তু মাইতিদা কি তলে তলে ওদের সঙ্গে আবার কিছু একটা যোগাযোগ . . . কথাটথা . . . কিছুই বলা যায় না . . . ।

কোর্টরুমে বসে থাকতে-থাকতে আজ আবার সেই কথাগুলো যেন হঠাৎই মনে পড়ল সুদীপার । মাঝখানের দিনগুলো কেটে গেছে লইয়ার-কোর্ট-কর্পোরেশন-ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিস . . . এইসব করতে করতে । সুরূপার সঙ্গে ডিটেল আলোচনার সুযোগ হয় নি । ও-ও ব্যস্ত ছিল প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়ি, চঞ্চলের একটু শরীর খারাপ . . . এসব নিয়ে । সত্যি কথা বলতে কি, এর মধ্যে মাইতিও আর ওই প্রসঙ্গে কোনও কথা বলে নি তো !

কেস-এর ব্যাপার নিয়ে মাঝে মধ্যে সন্ধে বেলা বাড়িতে বসে কথা হয়েছে । ইতিমধ্যে আরও কিছু পুরনো বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ এবং যোগাযোগ-ও হয়েছে । রূপা তো নিজের গাড়ি আর প্রশান্ত-ড্রাইভারকে প্রায় ছেড়েই দিয়েছে দিদিভাইয়ের জন্য । সুদীপা অবশ্য তাসত্বেও এবার এসে পর্যন্ত কিরকম একটা অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পান নি । স্পষ্ট কাউকে দেখেন নি . . . কিন্তু বারবার যেন অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়র অনুভবে মনে হয়েছে, কেউ একটা ওঁকে ফলো করছে . . . নজর রাখছে ওঁর গতিবিধির ওপর । হয়তো মনের ভুলই । বলব না বলব না করেও কথাটা শেষপর্যন্ত মাইতিকে না বলে পারেনি । মাইতিই তো সব থেকে কাছের মানুষ । ও অবশ্য ব্যাপারটাকে পাত্তা দেয় নি । বলেছে, বহুদিন তো এদেশে থাকেন না . . . তার ওপর কোর্ট-কেস-থানাপুলিশ-উকিল . . . এসবের চক্কর-এ পড়েছেন . . . সেইজন্যেই একটা প্যানিক কাজ করছে মনে মনে . . . । ওসব চলে যাবে ।

মাথা থেকে সরাবার চেষ্টা করেছেন সুদীপা । তাহলেও একই বাড়ির অন্য তলায় শত্রুর বসবাস । ওঠানামার সময় অস্বস্তি তো হবেই । তবে তিনতলা থেকে সুদীপা অবশ্য এবার আর কখনই একা ওঠানামা করেন না । কেউ না কেউ সঙ্গে থাকে ।

সুদীপার পাশে বসেই নীচু গলায় কারুর সঙ্গে কথা বলছে মাইতি । ওর কান বাঁচিয়ে তিনি সুরূপাকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন . . . কিন্তু হল না । গ্যালারিতে বসেই দেখতে পেলেন, সঙ্গে আর একজন কালো কোট এবং সেই রোগা লম্বা সামন্তকে নিয়ে অপূর্ব রঞ্জন মল্লিক কোর্টরুমে ঢুকলেন । আবার ওঁদের পিছনেও কয়েকজন । তাদের মধ্যে অপুকে দেখে সুদীপা বুঝলেন, ওরা হচ্ছে অপুদের লইয়ার । ঘড়ি দেখলেন সুদীপা । পৌনে চারটে বাজে । আর চোখ তুলতেই বুঝলেন, ডানদিকে দু-তিন ধাপ নিচেয় বসা একজোড়া চোখ গভীরভাবে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে । এবং চোখাচোখি হতেই সেই মাঝবয়সী লোকটি মুখ ঘুরিয়ে ফেলল । লোকটাকে কি আগে দেখেছেন সুদীপা !

ভাবনাটা এগুলো না । মাইতি টেলিফোন ছেড়ে সুদীপার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে, অপুদের দলের সামনের লোকটিকে দেখিয়ে বলল, দীপাদি . . . ওইটা হচ্ছে সেই ছ্যাঁচড়া লইয়ারটা . . . দেবকান্ত মিশ্র ।

সুদীপা ভেতরে ভেতরে একটা উত্তেজনা টের পেলেও চুপ করে বসে রইলেন ।

একটা অস্বস্তি টের পাচ্ছিলেন মনে মনে । চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে দেওর অরুণাভ আসবে লেকগার্ডেন্স্-এর

বাড়িতে। দুদিন আগে সবদিক ভেবেচিন্তে সময়টা ঠিক করা হয়েছিল। কোর্টকেস থাকলেও, ভেবেছিলেন চারটের মধ্যে বাড়ি ফিরে আসতে পারবেন। এখন তো দেখছেন প্রায় চারটে বাজে এখানেই।

কিছু করার নেই। অরুণাভ এসে বসে থাকবে। প্রীতিলতা অবশ্য বাড়িতে থাকবেন। সুদীপা মাকে বলেও এসেছেন ওর আসার কথা। আসলে অরুণাভ অস্থির হয়ে উঠেছে শ্রীরামপুরের বাড়ির জটিলতা নিয়ে। ভগ্নীপতি দীপক তো বটেই সঙ্গে জয়াও বোধ হয় এবার একটু একটু করে চাপ সৃষ্টি করছে ওর ওপরে, যাতে অরুণাভ বাধ্য হয় ওদের পছন্দমতো একটা সিদ্ধান্তে আসতে। সুদীপাকে ওরা ততখানি ধর্তব্যের মধ্যেই রাখে না, কেননা, প্রথমত তাঁর স্বামী প্রয়াত, দ্বিতীয়ত তিনি প্রবাসী। ভাবখানা যেন শ্বশুরবাড়ির মফস্‌সালি সম্পত্তিতে তাঁর আর কতটুকুই বা অধিকার! দরকারটাই বা কী!

সুদীপা এটাও জানেন, দীপকরা স্থানীয় পাড়া বা এলাকায় তাঁর সম্পর্কে একটি নেতিবাচক মনোভাবও সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে মানুষের মধ্যে। অরুণাভই জানিয়েছে সে কথা। মফসস্‌লের কিছু মানুষ এখনও প্রবাসীদের সম্পর্কে গল্প বেশ ভাল খায়। সুদীপা-ই বা কী করবেন! পরিস্থিতিই এমন যে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তাঁর বসবাস করাটা কিছুতে হয়ে উঠছে না।

সুদীপা দেখতে পেলেন, সামনে নীচের দিকে, বিচারক তাঁর মঞ্চের সামনে ডেকে নিয়েছেন তাঁদের কেস-এর দুপক্ষের আইনজীবীদের। একবার এদিক, একবার ওদিকে তাকিয়ে টাকমাথা এবং চশমা ও টাই-পরা বিচারক দুপক্ষের উকিলকেই কিছু প্রশ্ন করছেন... তাদের উত্তর শুনছেন। মাঝেমধ্যেই তাঁর সামনের ফাইল খুলে দেখছেন উকিলদের কথা শুনতে শুনতে। দু-একবার যেন হাত নেড়ে কিছু নির্দেশও দিলেন, এবং একপক্ষকে থামিয়ে আর এক পক্ষের কথা শুনলেন।

অনেকটা দূর এবং উঁচু থেকে সুদীপা কিছু শুনতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু বেশ কয়েক মিনিট ধরে কেস চলছে, সেটা না বুঝতে পারার কোনো কারণ নেই। আরও বুঝতে পারছিলেন, তাঁর পাশে বসা মাইতিও মঞ্চের দিকে তাকিয়ে কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু রায় যে কোন পক্ষের দিকে যাচ্ছে তা কিছুই অনুমান করতে পারছে না।

কয়েক মিনিট পরে, সম্ভবত আর বসে থাকতে না পেরেই মাইতি উঠে পড়ল এবং সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে দাঁড়াল মঞ্চের কাছাকাছি। সুদীপা দেখলেন, বিচারপতি এবার হাত তুলে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন দু পক্ষের উকিলকে, এবং সম্ভবত নির্দেশ দিলেন — সরে গিয়ে নিজেদের জায়গায় বসার জন্য। অর্থাৎ কেস হয়ে গেছে। সামনের ফাইলে তিনি কিছু লিখছেন এবং সম্ভবত তা কেস্‌-এর রায়।

একটু পরেই বিচারক আবার উকিলদের আহ্বান করলেন, তাঁর মঞ্চ এবং ডেস্ক-এর সামনে। বোঝা যাচ্ছে বেশ কিছু উপদেশ এবং নির্দেশ দিচ্ছেন এবং হাতমুখ নেড়ে কিছু একটা ইংগিত করলেন তাঁর অফিসের দিকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মাইতি পিছন ফিরে ওপরে সুদীপার দিকে তাকিয়ে যেভাবে ডাকল, সুদীপা তাইতেই বুঝতে পারলেন, মামলার রায় তাঁর পক্ষে গেছে।

হাত তুলে মুখে একগাল হাসি মেখে মাইতি ডাকল, দীপাদি . . . নেমে আসুন . . . হয়ে গেছে।

সুরূপাকে সঙ্গে নিয়ে কোর্টরুম ছেড়ে বেরুতে-বেরুতেই সুদীপার মনে হল, একটা সম্পূর্ণ মিথ্যাকে মিথ্যা-বলেই প্রমাণের জন্য কী পরিমান বিপর্যস্ত হতে হল তাঁকে! সময়ের অপচয়, অর্থদন্ড, শারীরিক-মানসিক ক্ষতি . . . এসবের কি কোনো মূল্য নেই তাঁর এই স্বদেশভূমিতে! কোথায়, কার কাছে এর সদুত্তর পাবেন তিনি!

সুদীপা তখনও জানতেন না, তাঁর দুর্ভোগের সীমানা আরও কতদূর বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। . . .

(চলবে)

প্রখ্যাত সাহিত্যিক **নবকুমার বসু** ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। ''চিরসখা'' সহ অনেক জনপ্রিয় উপন্যাস তিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। প্রতিভাস প্রকাশিত 'তোমার আঁধার তোমার আলো' তাঁর নবতম উপহার, গত বইমেলায় প্রকাশিত। 'হটাবাহার' তাঁর প্রথম অন্ লাইন ধারাবাহিক উপন্যাস, তিনি বাতায়নের হাতে তুলে দিয়েছেন।

রমা জোয়ারদার

চা-ঘর

পর্ব ৪

[পূর্ব কথাঃ বীরেশ্বর মল্লিকের বাড়ির সামনে বকুলের সাথে রঘুর দেখা হয়ে গেল। বকুল ওই পাড়াতেই রাসবিহারী বাবুর বাড়িতে এসেছিল শুনে রঘু বেশ চিন্তিতভাবে বকুলকে রাসুবাবুর বাড়িতে আসা যাওয়া করতে বারণ করল। রাসবিহারীর বয়স ষাটের আশেপাশে, অকৃতদার। এই বয়সে এসে এখন তিনি বকুলকে বিয়ে করতে চান। বকুলও তাতে মত দিয়েছে। ওদিকে বকুল কিন্তু গোপনে রঘুকে বলেছে যে, সে মডেলিং এ যেতে চায় এবং সেজন্য সে প্রস্তুতি নিচ্ছে!

ইদানীং রাসবিহারীর সাথে বকুলের বিয়ের খবর কালিচকে একটা মুখরোচক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিয়ের আনন্দে রাসুবাবু যখন মশগুল, তখন খবর পাওয়া গেল স্টুডিও পাড়ার দালাল রাকেশের বাইকে চড়ে বকুল কালিচক ছেড়ে পালিয়ে গেছে!]

* * * * *

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরোবার সময়টা যত এগিয়ে আসছে, রঘুর ভিতরে টান টান উত্তেজনাটাও তত বাড়ছে! আজকাল রঘুর বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে কেমন যেন ধড়াস ধড়াস করে, আর পেটের মধ্যেও অদ্ভুতভাবে গুড়গুড় করে। আসলে রঘু তো সে রকম ভাবে কখনও স্কুলে পড়েনি, তাই পরীক্ষা, রেজাল্ট – এসবের অভিজ্ঞতাও তেমন নেই। অবশ্য খুব ছোট বেলায় বছর দুয়েক স্কুলে পড়েছিল, কিন্তু তখনও কোন পরীক্ষা দিতে হয়নি। পরীক্ষা কি, সেটা রঘু ওর মাস্টার মশাই-এর কাছেই শিখেছে। মাস্টার মশাই প্রশ্নপত্র তৈরী করে, সময় ধরে রঘুর পরীক্ষা নিতেন। প্রথম দিকে রঘু সেই প্রশ্নপত্রের অর্ধেকও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারত না। কিন্তু আস্তে আস্তে শিখে গেল। পরীক্ষা ব্যাপারটা কি, কেমন করে সময়ের মধ্যে সঠিক উত্তর লিখে বেশি নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করতে হয়, এসব বুঝে গেল। শেষ দিকে শুধু মাস্টার মশাই নয়, আলোদিদিও পরীক্ষা নিতেন। রঘুই বলত – 'দিদি, আপনি প্রশ্নপত্র বানিয়ে দিন। আমি পরীক্ষা দেব!' তবে কিনা মাস্টারমশাই বা আলোদিদির ঘরে বসে পরীক্ষা দেওয়া, আর অন্য সব পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে একসাথে পরীক্ষার হলে বসে মাধ্যমিক বোর্ডের পরীক্ষা দেওয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে!

পরীক্ষাগুলো অবশ্যর রঘু সবই ঠিকমতো দিয়েছে। এখন শুধু রেজাল্টের অপেক্ষা। সবাই বলছে, এসপ্তাহেই রেজাল্ট বেরোবে! মাস্টারমশাই বলেছেন – 'তোকে কোনো চিন্তা করতে হবে না রঘু। তোর রোল নম্বর তো আমার কাছে লেখা আছে। রেজাল্ট বেরোলেই আমি সব তোকে জানিয়ে দেব!' মাস্টার মশাই যে ঠিক সময়েই রেজাল্ট জানাবেন, সেটা রঘুও জানে। কিন্তু রেজাল্টটা যে কী হবে, সেটা তো রঘু জানে না! তাই চিন্তা হতেই থাকে। বিশেষ করে হাতে কাজ না থাকলে ওই একই চিন্তা মাথায় ঘোরে! পরীক্ষার পর হাতে যেন অনেক সময় মনে হয়! পড়াশোনা নেই, কেমন খালি খালি লাগে! মাস্টার মশাই বলেছিলেন – 'পড়ার অভ্যাসটা ছাড়িস না রঘু। আর কিছু হাতে না পাস খবরের কাগজ রোজ পড়বি। দেখবি, কাগজ পড়লে অনেক কিছু জানতে পারবি। তোদের দোকানে কাগজ তো রোজই আসে!'

তা অবশ্য আসে! দুটো খবরের কাগজ – একটা বাংলা, একটা ইংরেজি। খদ্দেরদের জন্যেই আসে। সকাল বেলা কাগজগুলো তাদের হাতে হাতেই ঘোরে। রঘু কাগজ পড়তে বসে দুপুরে খাওয়ার পর। তার বাংলা কাগজ পড়তেই বেশি ভালো লাগে। ইংরেজি কাগজের লেখা সব কিছু ঠিক বুঝতেও পারে না! তবুও পড়ে! মাস্টার মশাই বলেছেন – 'ইংরেজি কাগজ রোজ পড়বি! অন্তত প্রথম পাতা আর এডিটোরিয়াল পাতাটা পড়বি। দেখবি, পড়তে পড়তেই আস্তে আস্তে বুঝতে পারবি। এতে করে তোর ইংরেজিটাও ভালো হবে!'

দুপুরবেলা বাইরে তাতাপোড়া রোদ! এ সময়ে আজকাল চা-ঘরে সাধারণত কোনো খরিদ্দার আসেনা। রোদটা একটু পড়ে গেলে তখন আবার লোকজন আসা শুরু হয়। খাওয়া দাওয়ার পর রঘু দোকানে বসে কাগজ পড়ছিল। মুরারী প্যাসেজে

লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। জিতেন দাসও দুপুর বেলা একটা নাগাদ বাড়ি চলে যায়, আবার আসে সেই বিকেলে। বিল্টু দুটো চেয়ার জুড়ে নিয়ে, পা ছড়িয়ে বসে ঘুম-ঘুম চোখে মোবাইলে গান শুনছিল। এমন সময় চা-ঘরের ল্যান্ডফোনটা বেজে উঠল। বিল্টু উঠল না, শুধু চোখের কোনা দিয়ে রঘুর দিকে তাকাল। রঘু ফোন ধরতেই উল্টো দিক থেকে মাস্টার মশাই জানালেন রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। উত্তেজনায় রঘুর কথা আটকে যাবার জোগাড়। কোনো রকমে জিজ্ঞাসা করল – 'কেমন হয়েছে মাস্টার মশাই?'

বীরেশ্বর বাবু বললেন – 'এখন একবার আমার এখানে আসতে পারবি?'

'পারবো মাস্টার মশাই!' রঘু মাথা নাড়ে। 'আসছি এখনই!'

ঝট করে ফোনটা নামিয়ে রাখে রঘু। বীরেশ্বর বাবুর শেষ কথাটুকু – 'সাবধানে আসিস। হুড়োহুড়ি করিস না!' – সে শুনতেই পেল না! পায়ে চটি গলাতে গলাতে বিল্টুকে বলে গেল – 'রেজাল্ট বেরিয়েছে। মাস্টার মশাই এর বাড়ি যাচ্ছি!'

রোদে লাল, ভয়ে শুকনো মুখ নিয়ে প্রায় চুপি চুপি মাস্টার মশাই-এর ঘরে ঢুকল রঘু। ওকে দেখা মাত্র বীরেশ্বর মল্লিক বুকে জড়িয়ে ধরলেন! রঘু ফিসফিস করে বলল – 'পাশ করেছি?'

'পাশ করেছিস মানে ? ভীষণ ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করেছিস তুই! তুই আমার গর্ব, রঘু!' মাস্টারমশাই-এর চোখে জল। 'তুই আরো পড়াশোনা করবি। এবার উচ্চমাধ্যমিক দেবার জন্য তৈরী হ!' আমি যতটা পারি তোকে সাহায্য করব। 'তুই পারবি রঘু, তুই ঠিক পারবি!'

রঘুরও কেমন কান্না পেতে থাকে। মাস্টার মশাইকে প্রণাম করে কান্না জড়ানো গলায় বলে – 'সবই আপনার জন্য হল ! আমি তো কখনো ভাবতেই পারিনি যে আমি আবার পড়াশোনা করব!'

একটা প্লেটে কয়েকটা বাতাসা নিয়ে ধীরে ধীরে একটা পা টেনে টেনে মাস্টার মশাই এর স্ত্রী সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে রঘুর মুখে দুটো বাতাসা পুরে দিলেন। রঘুর মুখে হাসি, চোখে জল। টিপ করে গুরুপত্নীকে প্রণাম করল সে! তারপর ওনাদের কাছ থেকে বিদায় নিল।

দোকান থেকে হুট করে চলে এসেছে সে। বেরোবার সময় শুধু বিল্টুকে বলে এসেছে। কিন্তু বিল্টুও তো তখন ঝিমুচ্ছিল। কথাটা শুনেছে কিনা কে জানে?

এখন অনেক রাত। চারিদিক শুনশান। কদাচিৎ বড় রাস্তা দিয়ে এক আধটা গাড়ি যাবার সাঁই সাঁই আওয়াজ আসছে। চা-ঘরের পাশের জলা জমির ঝোপঝাড় থেকে একটানা ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। রঘুর চোখে ঘুম নেই। ঘরের পাখাটা ফুল স্পীডে ঘুরছে। আর তার থেকে ঘ্যা ঙর ঘ্যা ঙর ধরণের একটা একঘেয়ে যান্ত্রিক শব্দ উঠছে। ওই ঘরেই অন্য দিকে মুরারী ঘুমোচ্ছে। তার ভারি নিঃশ্বাসের সঙ্গে মৃদু নাসিকা গর্জন রাতটাকে যেন আরো গভীর করে তুলছিল।

আজ রঘুর রেজাল্ট জানার পরে নিশ্চিন্ত হয়ে, আরাম করে ঘুমোনোর কথা! কিন্তু কী আশ্চর্য, রঘুর চোখে ঘুম নেই। আজ রঘুর জীবনে এমন একটা আনন্দের দিন, অথচ রঘুর এখন ভীষণ কান্না পাচ্ছে! মনে হচ্ছে, এত বড় আনন্দ ভাগ করে নেবার জন্য ওর পাশে আজ আপনজন বলতে কেউ নেই! অবশ্য চা-ঘরের সকলে ওর ভাল রেজাল্টের কথা জেনে খুব খুশী হয়েছে। দাদু মানে দোকানের মালিক জিতেন দাস হরিপদ ঘোষের দোকান থেকে ছানার জিলিপি এনে ওদের সবাইকে খাইয়েছে! তবু কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁক থেকে গেছে! আজ রঘুর মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। বকুলের কথাও! ওই তো রঘুকে বলেছিল, আমার পুরনো বইগুলো নিয়ে তুই তো পড়তেই পারিস। সেই পড়াটুকু রেখেছিল বলেই না মাস্টারমশাই এর নজরে পড়ল! বকুল চলে যাবার পর রঘু আর যশোদা মাসীর কাছেও যায় না। আসলে মাসীর ওরকম দুঃখী চেহারা, করুণ অবস্থাটা রঘুকে বড্ড পীড়া দেয়! ও কি করবে বুঝে পায় না।

চা-ঘরের জানলা দিয়ে বাইরে নিম গাছের মাথার উপর মেঘেঢাকা চাঁদ দেখা যাচ্ছে। দূর আকাশের ওই চাঁদের দিকে চেয়ে রঘু অনেকদিন আগে হারিয়ে ফেলা মাকে বলল – 'জানো মা, তোমার রঘু আজ মাধ্যমিক পাশ করেছে। খুব ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করেছে! তুমি বলেছিলে আমার বাবা নাকি অনেক পড়াশোনা জানা লোক! হোক গে, আমার তাতে কিচ্ছু আসে যায় না। আমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে চাই, শুধু তোমার জন্য আর মাস্টারমশাইয়ের জন্য! আরো একটা কথা বলি, মা! তোমার ছেলে এখন শুধু মাত্র রঘু নয়! তার নাম এখন রঘু নাথ ভারতী। নামটা তোমার ভালো লাগছে তো?' রঘুর মনে পড়ল, মাস্টারমশাইয়ের কাছে বসে সেই মাধ্যমিকের ফর্ম ভর্তি করার কথা। ফর্মে নাম লেখার সময় রঘু বলেছিল – 'মাস্টারমশাই, শুধু রঘু নয়, এখন থেকে আমার নাম রঘুনাথ ভারতী হল !'

কথাটা শুনে বীরেশ্বর মল্লিক সচকিত হয়ে রঘুর দিকে তাকিয়েছিলেন ! রঘু বলেছিল – 'হ্যাঁ মাস্টারমশাই, বাবা-মা আমাকে পুরো একটা নামও দিয়ে যায়নি। শুধু রঘু। মনে হয় যেন একটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো। কাগজের বাকি অংশটা অন্য কোথাও পড়ে আছে! এই টুকরো কাগজে যেটা লেখা আছে সেটা যেন অসম্পূর্ণ। বাকি কাগজের টুকরোটা খুঁজে এনে জোড়া দিলে তবেই লেখাটা সম্পূর্ণ হবে!'

বীরেশ্বরবাবু খানিকটা আশ্চর্য অথচ গর্বিত হয়ে রঘুর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন – 'তোর মনে এত কথা, এত অভিমান জমে আছে ? আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি রে রঘু, কি চমৎকার তোর অভিব্যক্তি! তুই অনেক দূর যাবি রঘুনাথ ভারতী!' এরপর দুজনেই হেসে উঠেছিল!

'কিন্তু ভারতী পদবী যতদূর জানি বাঙালিদের মধ্যে নেই!' কথাটা বলে মাস্টারমশাই রঘুর দিকে তাকালেন। রঘু গম্ভীর ভাবে বলল – 'তাতে কি এসে যায় মাস্টারমশাই? ভারতী আমার মায়ের নাম, আর ভারত আমার দেশ – সেটাও তো আমার সঙ্গে রইল!'

বীরেশ্বর বাবুর চোখে মুখে আনন্দ ফুটে উঠল। সপ্রশংস ভাবে মাথা নেড়ে বললেন – 'বেশ, তবে তাই হোক। ছোট গণ্ডি থেকে বড় গণ্ডিতে চলে গেলি!' চাঁদের দিকে তাকিয়ে মায়ের সাথে কথা বলতে বলতেই এসব মনে পড়ে গেল রঘুর। ওর মনে হল কথাটা শুনে চাঁদের আলোটা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো !

পরদিন সকালে অখিল ঘোষ আর বাসুদেব নন্দী প্রাতঃভ্রমণ সেরে চা-ঘরে এসেই রঘুকে ডাকলেন। রঘুর ভালো রেজাল্টের খবর পেয়ে ওনারাও খুব খুশী। রঘুর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক আশীর্বাদ করে বললেন – 'এত ভালো রেজাল্ট যখন করেছিস, পড়াটা ছাড়িস না। চেষ্টা চরিত্র করে চালিয়ে যা।'

সকাল বেলা চা-ঘরে আড্ডা জমে উঠেছে। যারা উপস্থিত আছে তারা সকলেই এখানকার নিয়মিত খরিদ্দার। আসলে চা-টা তো একটা উপলক্ষ্য। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আড্ডা। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সবাই খবরের কাগজের পাতা উল্টায়, ভাগাভাগি করে কাগজ পড়ে। টক ঝাল মিষ্টি সবরকম খবর নিয়ে নানা রকম আলোচনা হয়। কেউই তার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে একটুও ইতস্ততঃ করে না। ফলে প্রায়ই তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায়! দু তিন জন একসাথে কথা বলতে থাকে। মতানৈক্যের কারণে মাঝে মাঝে আবহাওয়া যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তবে তাই নিয়েও খুব একটা কেউই মাথা ঘামায় না। একটা রাতের বিশ্রামের পর সকাল বেলা আবার সবাই যে যার মত চায়ের আড্ডায় পৌঁছে যায়। আজকেও সে রকমই চা আর খবরের কাগজ সহযোগে কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলছিল। জিতেন দাসও দোকানে এসে গেছে। ক্যাশবাক্সের সামনে তার নিজের চেয়ারটায় বসে আছে।

গোপেন বাবু বললেন – 'জিতেন বাবু, আমাদের একটা আর্জি আছে।' জিতেন দাস মুখ তুলে বললেন – 'অবশ্যই! আর্জি নয়, বলুন আদেশ। আপনারাই তো আমার লক্ষ্মী। বলুন কি করতে হবে?'

গোপেন বাবু গোঁফের ফাঁকে একটু হাসি ছড়িয়ে বললেন – 'এই কথাটা ঠিক সেরকম নয়, একটু অন্যরকম। আমাদের রঘু এত ভালো রেজাল্ট করল, তাই আমরা সবাই ঠিক করেছি ওকে নিয়ে আমরা একটু সেলিব্রেট করব!'

জিতেন দাস কথাটা ঠিক ধরতে পারল না। সেলিব্রেট করবে মানে কি? কাঁঠালটা কি তার মাথাতে ভাঙবে? না না, জিতেন দাস এতটা বোকা নয় যে কেউ বললেই সে ক্যাশবাক্স খুলে টাকা বার করে দেবে। তাকেও তো ব্যবসা করে খেতে হয়! অবশ্য এটা ঠিক যে, রঘুকে সে ভালোবাসে। সেই ছোট্ট বেলা থেকে দেখছে। এখন ওর রেজাল্ট ভালো হওয়াতে সে নিজেও খুব খুশি। আর সেইজন্যই তো কাল ওদের সবাইকে সে ছানার জিলিপি খাইয়েছে। কিন্তু তাই বলে পাড়াশুদ্ধ লোককে? না, অতটা সে করবে না।

জিতেন দাসের কপালে একটা ভাঁজ পড়ল। রঘু রান্নাঘর থেকে চা নিয়ে আসছিল। গোপেন বাবুর কথাটা কানে যেতেই একেবারে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে অখিল বাবু এবার বললেন – 'কিরে রঘু, তুই ওরকম স্ট্যাচু হয়ে গেলি কেন? চা-টা দিয়ে যা। আর শোন, তোর পাশের জন্য আমরা ফিস্টি করব। কিন্তু তোকে তাই নিয়ে কিছু ভাবতে হবে না। ব্যবস্থা যা করবার আমরাই করব। তুই তোর নিজের কাজ করে যা!'

ওখানে বসে তখনই আলোচনা করে ঠিক হল যে পরদিন রাতে দোকান বন্ধ হবার পর চা-ঘরেই ফিস্টির খাওয়া হবে। রান্না বাড়া যা করবার মুরারী আর বিল্টু করবে। খরচাপাতি যা হবে সেটা এই ভদ্রলোকেরা যারা ভোজের ব্যবস্থা করছেন তারাই চাঁদা তুলে দিয়ে দেবেন! রমেশ বাবু বললেন – 'আমরা ছাড়াও আরো দু একজনকে বলতে হবে। যেমন মাস্টারমশাই, বাসুদেব, এই রকম আর কি!'

গোপেনবাবু মাথা নাড়লেন – 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাস ওই থাক। বেশি ভীড় বাড়িয়ে কাজ নেই!'

সবাই রঘুর পিঠ চাপড়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে বলল – 'কিরে রঘু, খুশী তো?' রঘু আহ্লাদে আটখানা! কি বলবে ভেবে পায় না।

কয়েক মাস হল, চা-ঘরে দুজন সদস্য বেড়েছে। একজন হল বাদল – ফাই ফরমাস খাটে। বয়স চোদ্দ-পনের – দেখলে আরো কম মনে হয়। অন্যজন সীতারাম। সে প্রধানত মালি, তবে দরকার মত বাজার-হাট বা আন্য কাজকর্মও করে! এরা দুজনেই সকালে আসে আর রাতে আটটা নাগাদ বাড়ি চলে যায়।

গোপেন বাবুদের দলটা বেরিয়ে যেতেই বাদল রঘুর কাছে এসে বলে – 'রঘুদা, কালকের ফিস্টিতে কিন্তু আমিও থাকব!'

রঘু বলে – 'আমায় বলছিস কেন? আমি কি কিছু করছি? তুই বরং দাদুকে বল।'

ঘাড় গোঁজ করে বাদল বলে – 'আমার ভয় করে। তুমি বলে দাও। তুমি বললেই দাদু মেনে যাবে!'

বাদলের কথায় রঘু একটু অস্বস্তি বোধ করে। ওর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মায়া লাগে রঘুর। বয়সের হিসেবে বাদল অত কিছু ছোট নয়। কিন্তু ভাবভঙ্গিতে এখনো ছেলেমানুষ। রঘু ভাবে, বাড়িতে ওর মা আছে, দাদা আছে। সেখানে ওর আদর আছে, আবদার আছে। তাই হয়তো বাদল এখনো ছেলে মানুষ আছে। ও স্কুল না গিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত, তাই ওর দাদা ওকে এই চা-ঘরে কাজ করতে ঢুকিয়ে দিল। প্রথম প্রথম বাদল বেশ মনমরা হয়ে থাকত। যখন তখন দোকানের পিছনে, কলতলার পাশে উঁচু ঢিবিটার উপর বসে থাকত। এখন বেশ কিছুদিন ধরে থাকতে থাকতে অনেক সহজ হয়ে গেছে! তবে মায়ের সঙ্গে বসে ভাত খাবে বলে এখনো সে রোজ দুপুরে বাড়ি চলে যায়!

রঘু বাদলকে আশ্বাস দিয়ে বলে – 'আচ্ছা, দেখছি!'

রঘুকে অবশ্য কিছুই বলতে হল না। কারণ জিতেন দাস নিজে থেকেই বাদল আর সীতারামকে ডেকে বলল, তারা যেন পরদিন দোকানে রাতের খাবার খেয়ে যায়। আর বাড়িতেও যেন সে কথা বলে আসে। কথাটা শুনেই বাদল তো লাফাতে লাফাতে এসে রঘুকে খবরটা দিল। নেমন্তন্ন পেয়ে দারুণ খুশি সে! অন্য দিকে সীতারাম খাবার কথায় হাত জোড় করে জিতেন দাসকে বলল – 'মাপ করবেন বাবুজী, আমি এখানে খেতে পারব না। আমার কিছু ছোঁয়া-ছুঁয়ি মানামানির ব্যাপার আছে। আমি বাড়িতেই খাব!'

জিতেন দাস মন দিয়ে সীতারামের কথাটা শুনে গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বলল – 'আচ্ছা, ঠিক আছে!'

কাজের মধ্যেই এক ফাঁকে রঘু জিতেন দাসের কাছে গিয়ে বলল – 'দাদু, আজ বিকেলে এক ঘন্টার জন্য ছুটি দেবে? আলোদিদিকে পাশের খবরটা দিয়ে আসব!'

হিসেবের খাতা থেকে চোখ উঠিয়ে জিতেন বলল – 'আলোদিদি, মানে তোর অঙ্কের দিদিমনি? তাকে বলিসনি এখনও? যা দেখা করে আয়। তবে দেরী করিস না। চটপট চলে আসিস। বাদল এখনও সবকিছু ঠিকমত সামাল দিতে পারে না। বিল্টু অবশ্য থাকবে। তবুও, আসলে কাজও তো এখন বেড়ে গেছে!'

রঘু জোরে জোরে মাথা নাড়ে – 'আমি একদম দেরী করব না। চটপট চলে আসব!'

রঘুকে দেখেই আলো বলে উঠল – 'কাল থেকে তোর কথা ভাবছিলাম!'

রঘু একটু কাচুমাচু মুখ করে উত্তর দিল – 'আসলে দাদুর কাছে ছুটি না নিয়ে তো আসতে পারি না!' কথাটা বলেই আলোকে ঢিপ করে একটা প্রণাম করল রঘু। মাথা তুলে উজ্জ্বল হাসিভরা মুখে বলল – 'অঙ্কে সাতানব্বুই পেয়েছি দিদি!'

খুশিতে ভরে উঠল আলোর মুখখানা। রঘুকে বলল – 'বলিস কি! এত ভালো! আয় ঘরে এসে বোস। কিসে কি পেলি সবটা শুনব।'

সব বিষয়ের নম্বর জানার পর আলো খুশি হয়ে রঘুর হাতে দুটো পাঁচশো টাকার নোট দিল। রঘু ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে বলে উঠল – 'কি? আপনি টাকা দিচ্ছেন কেন দিদি?'

আলো রঘুর মাথায় হাত রেখে বলল – 'ওটা তোর প্রাইজ। ভালো রেজাল্ট করেছিস, তাই এই দিদি তোকে এটা প্রাইজ হিসেবে দিল!'

রঘু কি বলবে বুঝতে না পেরে ছলছল চোখে চুপ করে বসে রইল। একটু পরে আলো বলল – 'তোকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম। জানিনা তুই আবার কিভাবে নিবি!'

রঘু একটু অবাক হয়ে আলোর দিকে তাকিয়ে বলল – 'আমি আবার কিভাবে নেবো? আপনি বলুন না আলোদিদি! কি বলতে চান, বলুন।'

আলো একটুক্ষণ চুপ করে কিছু একটা ভেবে নিল। হয়তো বা কথাটা একটু গুছিয়ে নিচ্ছিল। তারপর বলা শুরু করল।

– 'দ্যাখ রঘু, মাধ্যমিক আর উচ্চ-মাধ্যমিকের মধ্যে কিন্তু তফাৎ আছে। ইলেভেন-টুয়েলভের পড়া ক্লাস টেনের পড়া থেকে অনেকটাই কঠিন! ওই চায়ের দোকানে কাজ করে, প্রাইভেটে পড়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা প্রায় অসম্ভব বলা যায়। তাই বলছিলাম, তোর জন্য যদি একটা স্কুলের বন্দোবস্ত করা যায়!'

উৎসাহে চকচকে হয়ে ওঠে রঘুর চোখ দুটো। কিন্তু পরক্ষণেই স্তিমিত স্বরে বলে – 'কি করে হবে সেটা ? কোথায় থাকব? টাকা পয়সাও তো লাগবে!'

আলো ওকে থামিয়ে দেয় – 'সেগুলো নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। আমি জানি এরকম স্কুল আছে যেখানে ফ্রীতে গরীব ছেলেদের থাকা খাওয়া পড়াশোনা করার সব ব্যবস্থা আছে!'

অবাক হয়ে আলোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে রঘু। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে – 'অনাথ আশ্রম?'

উত্তরে আলো বলে – 'না, ঠিক অনাথ আশ্রম নয়। মূলতঃ গরীব ছেলেদের জন্য! তবে তার মধ্যে অনাথও দু-একজন থাকতে পারে। তবে আশ্রম ওটাকে বলতেই পারিস। কিছু নিয়ম কানুন ওদের মেনে চলতে হয়।'

রঘু আবার জিজ্ঞাসা করে – 'আমি ওই স্কুলে পড়তে পারব?'

আলো স্নেহের হাসি হেসে রঘুকে আশ্বাস দেয় – 'কেন পারবি না? কত ছেলে তো পড়ছে সেখানে! অন্তত চেষ্টা তো করেতেই পারি। আমার এক আত্মীয় আছে, তার ভালো যোগাযোগ আছে ওই স্কুলের সাথে। তুই যদি চাস তো কথা বলব তার সঙ্গে।'

'আশ্রমটা কোথায়?' রঘু জানতে চায়।

'পুরুলিয়াতে!' আলো জানায়।

একটু চিন্তা করে রঘু বলে – 'আমাকে দু'দিন সময় দেবেন দিদি ? দাদুর সাথে, মাস্টার মশাইয়ের সাথে একটু কথা বলব। আসলে এদের কাছেই তো এতদিন ধরে রয়েছি! চা-ঘর যদিও আমার কাজের জায়গা, তবু ওখানেই তো আমি থাকি! কাজেই ওটাই আমার ঘর বাড়ি। সেটা ছেড়ে যাবার আগে একটু কথা বলতে চাই!'

চা-ঘরে আজ ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। বাইরে থেকে দেখলে অবশ্য ততটা বোঝা যাচ্ছে না। রোজকার মতোই লোকজন আসছে-যাচ্ছে, চা-টা খাচ্ছে। কিন্তু দোকানের ভিতরে বেশ যেন একটা নেমন্তন্ন বাড়ির জোগাড় যন্তর চলছে। রাতের খাওয়া দাওয়ার জন্য। মাংস এসে গেছে। বড় বড় আলুর টুকরো দিয়ে সেটা বেশ জুত-জাত করে রান্নার ব্যবস্থা হচ্ছে। রাতের মেনুতে আছে ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা, মাংস, চাটনি আর রসগোল্লা! বাদল আজ দারুণ উৎসাহে দৌড়ে দৌড়ে সব কাজ করছে। রঘুকে আজ সকলেই একটু যেন বিশেষ ভাবে দেখছে। রঘু কোনো দিন ভাবতেই পারেনি যে তাকে কেন্দ্র করে এরকম একটা আনন্দ ভোজের আয়োজন হতে পারে! খুশিতে, সবার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মনটা একবারে ভরে উঠছিল।

বিকেলের দিকে রঘু রান্নাঘরে কিছু একটা করছিল। বাদল এসে বলল – 'রঘুদা, বাইরে একটা ছেলে তোমার খোঁজ করছে!' রঘু একটু অবাক হল। তাকে আবার কে এখানে খুঁজতে আসবে? বাইরে বেরিয়ে দেখল, বকুলের ভাই সঞ্জু একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে রঘুর মনে হল, এই কমাসের মধ্যেই সঞ্জু যেন অনেক বড় হয়ে গেছে।

কাছে গিয়ে রঘু জিজ্ঞাসা করল – 'কিরে সঞ্জু, কি খবর ? মাসী কেমন আছে?'

ঘাড় নেড়ে সঞ্জু উত্তর দিল, ভালো। তারপর হাতের প্যাকেটটা রঘুর হাতে দিয়ে বলল – 'মা তোমার পাশের খবর পেয়ে এটা পাঠালো। একটা নতুন জামা আছে। মা বলেছে আজ ফিস্টির সময় তুমি ওটা গায়ে দিও। আর এই কৌটোতে মা তোমার জন্য নিজের হাতে নারকেলের নাড়ু বানিয়ে পাঠিয়েছে!'

জিনিসগুলো নিতে গিয়ে রঘু দুহাতে সঞ্জুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল! – 'মাসী এলো না, সঞ্জু?' কথাটা বলেই আবার নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল – 'আসবেই বা কেন? অভিমান তো হতেই পারে। আমারই তো যাওয়ার কথা। তুই মাসীকে

বলে দিস, আমি দু-এক দিনের মধ্যেই যাব!' একটু থেমে এবার অনুরোধ করল – 'সঞ্জু, আজ রাতে তুই এখানে আমাদের সাথে খাবি?'

সঞ্জু মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল। মুখে বলল – 'না, রঘুদা, আজ থাকতে পারব না। আমি এখন যাই?'

রঘুও মাথা নাড়ল। সঞ্জু পিছন ফিরে দু চার পা এগোতেই রঘু আবার ডাকল – 'সঞ্জু, বকুলের কোনো খবর পেয়েছিস?' প্রশ্ন শুনে থেমে গেল সঞ্জু ! জোরে জোরে 'না' সূচক মাথা নেড়ে আবার আগের মতই চলতে লাগল!

রাত নটা বাজতে না বাজতেই একে একে গোপেনবাবু, অখিলবাবুরা সবাই এসে চা-ঘরে জমা হল। সবার শেষে এলেন রাসু বাবু। পরণে জীনস টি-শার্ট নয়, নেহাত সাদা মাটা পাজামা আর ঢিলেঢালা ফতুয়া। রঙবিহীন মাথার চুল বেশিটাই সাদা। হাতে একটা বড়সড় দইয়ের হাঁড়ি। হাঁড়িটা একটা টেবিলের উপর রেখে বললেন – 'আমাকে তো আপনারা কেউ ডাকেননি, কিছু বলেনও নি। নেহাত আজ বিকেলে বীরেশ্বরবাবুর সাথে দেখা হল। কথায় কথায় ওনার কাছে রঘুর রেজাল্টের কথা জানলাম। রঘুকে তো আমিও সেই ছোট বেলা থেকেই দেখছি! ওর এমন খুশির দিনে আমিই বা কি করে দূরে থাকি! তাই নিজে নিজেই চলে এলাম।'

ইতিমধ্যে ওখানে উপস্থিত দু-চারজন এদিক থেকে, ওদিক থেকে কথা বলতে শুরু করেছে !

'সত্যি, বড় ভুল হয়ে গেছে!'

'আসলে কি, সেভাবে তো ঠিক নেমন্তন্ন করা হয়নি কারোকে।'

'ভালো করেছেন, চলে এসে খুব ভালো করেছেন!'

'কিন্তু মিষ্টি আনতে গেলেন কেন? মিষ্টিমুখের জন্য রসগোল্লা তো আনা হয়েছে!'

রাসুবাবু একগাল হেসে বোদ্ধার মত মাথা নেড়ে বললেন – 'হুঁ হুঁ, সে আমি জানি। সেই জন্যই তো একহাঁড়ি দই নিয়ে এলাম। দই ছাড়া বাঙালিদের ভোজ জমে নাকি?'

জিতেন দাস এতক্ষণ রান্নাঘরে কিছু একটা তদরকী করছিল। সবার কথাবার্তা শুনে এবার রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল – 'বাহ, সবাই এসে গেছেন! খুব ভালো হয়েছে। আমাদের রান্নাও হয়ে গেছে। আপনারা সবাই বসুন। কই রে, রঘু কই? আয় এখানে। তোর জন্যই তো আজ এত কিছু হচ্ছে!'

রঘু আজ সন্ধ্যাবেলা স্নান করে, যশোদার দেওয়া নতুন শার্ট আর গতবারের পূজোয় পাওয়া ফুলপ্যান্টটা পরেছে। পরিপাটি করে চুল আচঁড়েছে। এখন দেখে বোঝা যাচ্ছে রঘুকে আসলে দেখতে বেশ ভালো। যশোদা বলে, রঘুকে ওর মায়ের মত দেখতে। রঘুর অবশ্য সেরকম মনে হয় না। বিশেষ করে এখন তো একেবারেই মনে হয় না। ওর মুখ ভর্তি হাল্কা হাল্কা দাড়ি-গোঁফ, মার সাথে কি করে মিল হবে? মাসী বলে, চোখ দুটো আর থুতনিতে নাকি মিল আছে। কেন কে জানে, যশোদা মাসীর এই কথাটা শুনতে রঘুর খুব ভালো লাগে। এই 'মিল আছে' ভাবতে রঘুর খুব ভালো লাগে! মনে হয়, তার মা চলে গিয়েও তার সঙ্গে রয়ে গেছে!

জিতেন দাস ডাকতেই রঘু সবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। রঘুর পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় আর পরিপাটি চেহারা কারো দৃষ্টি এড়ালো না। স্বতস্ফূর্ত ভাবে কেউ কেউ বাহ বলে উঠল। গোপেন বলল – 'আজ তো রঘুকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে!'

রঘু লজ্জা লজ্জা মুখে বলল – 'শার্টটা নতুন, যশোদা মাসী দিয়েছে!'

রঘুকে কাছে ডেকে বীরেশ্বর মল্লিক একটা খাম বার করলেন। বললেন – ‘এখানে উপস্থিত আমরা সকলে মিলে তোকে আশীর্বাদ করে এটা দিচ্ছি। এতে আট হাজার টাকা আছে। টাকাটা তোর পড়াশোনার কাজে লাগবে!’ রঘু হাত বাড়িয়ে খামটা নিতে গিয়েও টাকার কথা শুনে সংকোচে হাত গুটিয়ে নিল!

জিতেন দাস বলল – ‘ওটা নিয়ে নে। নিয়ে সবাইকে প্রণাম কর। গুরুজনদের আশীর্বাদ, না বলতে নেই!’ দুহাত পেতে খামটা নিয়ে রঘু বলল – ‘এ যে অনেক টাকা! আমি কোথায় রাখব ?’ রঘুর কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো! জিতেন বলল – ‘কেন তোকে ব্যাঙ্ক-কে অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছি না ? ওখানে রাখবি!’

খাওয়া দাওয়ার পর সব গুছিয়ে গাছিয়ে রান্নাঘরের কাজ সারতে অনেক রাত হয়ে গেল। বিল্টু এবং বাদল কেউই আর রাতে বাড়ি ফিরল না। চাটাই, চাদর যা পেল পেতে দোকানেই শুয়ে পড়ল।

বিছানায় শুতেই রঘুর দু-চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। ঘুম ঘুম চোখে সে জানলা দিয়ে নিমগাছের মাথায় উপর চাঁদের দিকে তাকালো। আজ যেন চাঁদটাকে আরো কাছে মনে হলো। নির্মেঘ আকাশে চাঁদের আশেপাশে অনেক তারা ঝিলমিল করছিল। চোখ বন্ধ করার আগে রঘু চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল – ‘তোমার রঘুর জন্য চিন্তা কোরো না মা। এখানে সবাই আমাকে ভালোবাসে। তুমি দেখো, তোমার রঘুনাথ ভারতী একদিন ঠিক মানুষের মত মানুষ হবে!’

রঘু মনস্থির করে ফেলল – আলোদিদিকে কালকেই গিয়ে বলে দেবে যে পুরুলিয়ার ওই স্কুলে সে যাবে না! এই চা-ঘরে থেকেই সে পড়াশোনা করবে !

(চলবে)

রমা জোয়ারদার – দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম। গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলনঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ৩

শহরে সূর্য ডুবছে। অর্ধেক পৃথিবীর সঙ্গে রোজের মতো সূর্য ডুবছে এ শহরের এক ছাদেও। ছাদের পাশেই এক বিশাল গাছ। প্রচুর পাখির আশ্রয় সেখানে। এখন এই শেষ বিকেলে গাছটা যেন জেগে উঠেছে পাখিদের কিচিরমিচিরে। ছাদের এদিক ওদিক কিছু ফুলের টব। গ্রীষ্ম এসে দাঁড়িয়েছে বসন্তের পেছনে। মরশুমী ফুলের চারায় ভরা টবগুলো। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে টবটা বুকে ধরে রেখেছে দোপাটির চারা, তার সামনে শুয়ে আছে শিঞ্জিনি, মাটিতে সটান। আকাশ দেখছে সে। এই সময়ের আকাশ বড় প্রিয় তার। এ সময়ে আকাশকে রোজ মন দিয়ে ফেলে সে। মন – বড় দুর্লভ বস্তু এক, এই উনিশেই বুঝেছে শিঞ্জিনি। শিঞ্জিনি রায় – রক্ষণশীল বনেদী বাড়ির একমাত্র সন্তান। ছিপছিপে লম্বা শরীর, ঈষৎ চওড়া কপাল, ডান গালে ছোট্ট একটা টোল। কিন্তু সব ছাড়িয়ে যা তাকে সবার চেয়ে আলাদা করে, তা হল তার চোখ দুটো। পৃথিবীর সবচেয়ে শান্ত আর গভীর দীঘির ছায়া যেন ও চোখে। সে চোখে চাপল্য নেই, অস্থিরতা নেই, আছে তাকে আর তার মনকে বুঝে নেওয়ার নীরব আকুতি, পবিত্র প্রার্থনার মতো। শিঞ্জিনির মন বড় অন্যরকম। আর পাঁচজনের সঙ্গে সে মেলাতে পারেনা নিজের মনকে। কি যেন খোঁজে তার মন সব সময়ে। শিঞ্জিনি অনেক ভেবে দেখেছে, কিন্তু তল পায়নি নিজের মনের। তার কত বন্ধুরা তো পরীক্ষার ভালো ফল, জীবনের প্রতিষ্ঠাকে তাদের জীবনের খোঁজার বিষয় করেছে। শিঞ্জিনি ছাত্রী ভালো, ভালো ফলই করে সে। তবু ওসব তাকে স্পর্শ করেনা।

তার দুয়েকটি বান্ধবী এরই মধ্যে প্রেমিক জুটিয়েছে। তারা সেসব গল্প শোনায় তাকে। শুনতে ভালো লাগে তার, শুনে হাসেও, কিন্তু তৃপ্তি বা অপ্রাপ্তির কষ্ট কোনওটাই হয়না তার। শিঞ্জিনির কেবলই মনে হয় যে প্রেম বোধহয় এমন নয়। কবিতা লেখে সে। স্বভাব লাজুক মেয়েটা খুব কাছের দুয়েকজন বান্ধবীকে শুনিয়েছেও তার কবিতা। শুনে তারা উচ্ছসিত প্রশংসা করেছে। কিন্তু শিঞ্জিনি বোঝে, যা লিখছে , তা সে লিখতে চায়না। যা সে লিখতে চায়, তা তার কলমে আজও আসেনি। তার মনের মতো তার কবিতাও বুঝি হাতড়ে বেড়ায় তার অজানা, অদেখা প্রশ্নটাকে। কখনও কখনও শিঞ্জিনির মনে হয় যে সে হয়তো খুব আবছা ভাবে দেখতে পায় সেই প্রশ্নকে। ভালোবাসা কি ? ভালোবাসা কেমন ? তার বন্ধুরা যেমন বলে, তেমন ? না বোধহয়। ভালোবাসা মানে কি দেহের মাধ্যমে আত্মায় প্রবিষ্ট হওয়া, নাকি আত্মায় ভর করে দেহের আসা অনিবার্য ? ভালোবাসা মুক্তি না বন্ধন ? ভালোবাসা পাওয়ার নাকি না পাওয়ার ? সত্যিই কি সত্যিকারের ভালোবাসা পাওয়ার কোনও উপায় আছে ? থাকলে, কি তার মন্ত্র ? তার মধ্যে যৌবন আসা ইস্তক প্রচুর যুবকের চোখ ছুঁয়ে গেছে তাকে। সে সব চোখের ভাষা আলাদা আলাদা। কিন্তু কোনও দৃষ্টিপাতেই তো সে নিজের উত্তর খুঁজে পায়নি !

আজ সন্ধ্যাতে ছাদে শুয়ে এইসবই ভাবছিল শিঞ্জিনি। দিনের এই সময়টা একান্তই তার। ভাবতে ভাবতে চোখ বুজে এসেছিল। হঠাৎই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। চোখ বন্ধ অবস্থাতেই শিঞ্জিনি এক তীব্র আলো অনুভব করল। তীব্র অথচ শান্ত। কি এক গভীর সুখে সে যেন সে আলোয় ডুবে যেতে থাকল। তারপর হঠাৎই সেই আলো যেন স্তিমিত হয়ে এল আর তার মনের সামনে ভেসে উঠল দুই অতল, সমর্পিত চোখ। তেমন চোখ আগে কখনও দেখেনি শিঞ্জিনি, অথচ সে চোখ যেন তার বহু যুগের চেনা। আচমকা ঘোরটা কেটে গেল। এ কি দেখল সে ? আগে তো এমন দেখেনি কখনও। সে অনুভব করল যে তার খুব আনন্দ হচ্ছে। এমন আনন্দ আগে কোনওদিন হয়নি। এক গলা সুখে ছাদ ছাড়ল শিঞ্জিনি।

সে রাতে আবার এক কান্ড হল। রোজই সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে শিঞ্জিনি। বড় হওয়ার পর তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে দক্ষিণের মাঝারি ঘরটা। আজ সেখানে যেই সে চোখ বুজেছে, তার মনে ভেসে উঠল সেই আলোময় চোখ দুটো। চমকে চোখ খুলল শিঞ্জিনি। আবার ! আবার হল ! এরপর শুরু হল এক বিচিত্র খেলা। যতবারই চোখ বোজে, সেই

আলোকিত চোখেরা এসে জড়িয়ে ধরে তার মন। চোখ খুললেই উধাও। শিঞ্জিনি অনুভব করল সে যেন এক ঘোরের মধ্যে রয়েছে। সে উঠে বসল বিছানায়। মাথার কাছে রাখা নীল কবিতার খাতাখানা টেনে নিল নিজের কাছে। কিছু বোঝবার আগেই কলম চলতে লাগল তার। বেশ কিছুক্ষণ। একটা সম্মোহনের মতো। যেন যা লিখছে তার উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই শিঞ্জিনির। একটা সময়ে ঘোর কাটল। অবাক হয়ে সে দেখল যে খুব সুন্দর, খুব মন ছোঁয়া, গভীর একটা প্রেমের কবিতা তার খাতায়। এমন সূন্দর আর নিখুঁত কবিতা আগে কখনও লেখেনি সে। নিজের লেখনীতে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেল শিঞ্জিনি। তবে কি তার খোঁজ শেষ হল ? তবে কি সে পেল তার তার আরাধ্য ও আরাধ্যের মন্ত্রকে ? তার মন বারবার বলতে লাগল, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়েছি। শিঞ্জিনি উপলব্ধি করল, তার আরাধ্য কোনও প্রচলিত দেব-দেবী নয়, তার আরাধ্য ভালোবাসা, কবিতা যার মন্ত্র। সে রাতে খাতাটা বুকে জড়িয়ে খুব কাঁদল শিঞ্জিনি। এমন কান্না আগে কোনওদিন কাঁদেনি সে। তার চোখের জলে মিলে যেতে লাগল সুখ আর প্রাপ্তি মেশানো অজাগতিক এক আনন্দ। ভোর রাতের দিকে যখন প্রথম কাকটা অভ্যাস মতো ডেকে উঠল, শান্ত বালিকার মতো গভীর সুখের ঘুমে তলিয়ে গেল তৃপ্ত শিঞ্জিনি।

রোজের মতো বাড়ির দিকে পা বাড়ালো না নীল। কলেজ থেকে তার বাড়ি একটুই, মাত্র দু স্টপেজ। রাজবল্লভ পাড়ায় মস্ত যৌথ পরিবার তাদের। দাদু শ্যামাপদ সেন খুব নামজাদা উকিল ছিলেন। শ্যামাপদর দুই ছেলে-অসীম আর অনন্ত। সেযুগে এমন তাৎপর্যপূর্ণ মিল রেখে সাধারণতঃ নাম দেওয়া হতনা, কিন্তু ঠাকুমা লীলাবতী চিরকালই সময়ের থেকে এগিয়ে ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই নীল দেখেছে, তার ঠাকুমা একটু অন্যরকম। সংসারে আছেন, ব্যস্ত স্বামীর সুযোগ-সুবিধার দিকে নজর রাখছেন, দুই ছেলে ও এক মেয়ে অরুন্ধতীকে মানুষ করছেন, অথচ এই সবকিছুর বাইরেও তাঁর যেন আলাদা একটা সত্বা আছে। বাবা অনন্তর মুখে নীল শুনেছে, নিজেও দেখেছে, সময় পেলেই লীলাবতী বই পড়ছেন, বাড়িতে নানা মাসিক পত্রিকা আসছে, ভালো সিনেমা এলে বৌমাদের নিয়ে তা দেখতে যাচ্ছেন। আরেকটা অভ্যাস ছিল লীলাবতীর, নিয়মিত ডায়েরী লেখা। ঠাকুমা চলে যাওয়ার পর সে সব ডায়েরী পড়েছে নীল, অনুভব করেছে লীলাবতীর চিন্তাশক্তির ব্যাপ্তি ও স্বচ্ছতা। নীলের মনে আছে, সে যখন ছোট ছিল, কিছুতেই বন্ধুদের ঠাকুমাদের সঙ্গে লীলাবতীকে মেলাতে পারত না সে। উত্তর কলকাতার এই এঁদো অথচ বনেদী গলিগুলোতে আজও বেশ কিছু সাবেকী সংস্কার ও ধারণা ভেসে বেড়ায়। আঁশ, সগড়ি – এইসব শব্দ বাকি কলকাতার কাছে অর্থহীন হয়ে গেলেও শহরের এই পুরোনো অংশে এর গুরুত্ব বিশাল। অথচ নীল দেখেছে তার ঠাকুমা এর প্রভাব থেকে একদম মুক্ত ছিলেন।

রান্নাঘর থেকে ঠাকুরঘর – কোথাওই বাছ-বিছারের কোনও বাড়াবাড়ি ছিলনা তাঁর। তবে পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর ছিল প্রখর। আর পছন্দ করতেন চিন্তার স্বাধীনতা। উত্তর কলকাতার ধরণ মেনে তাদের বাড়ি একেবারেই পুরুষ প্রধান ছিলনা। শ্যামাপদ প্রতিষ্ঠিত উকিল ছিলেন, আদালত-চেম্বারে প্রতাপও ছিল খুব, কিন্তু সংসারে লীলাবতীর ব্যক্তিত্ত্ব আর পরিচালন ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি তিনি। সত্যি বলতে, লীলাবতী থাকাতে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন শ্যামাপদ। ঠাকুমার প্রতি নীলের ছিল এক গভীর টান। কিশোর বয়সে হঠাৎ লীলাবতীর চলে যাওয়াটা তাই তার কাছে ছিল এক বিরাট ধাক্কা। দীর্ঘদিন বড় মনমরা হয়ে থাকত সে। বাড়ির সবাই যখন তাকে নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, তখন নীলকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছিল ঠাকুমার ডায়েরীগুলো। ওগুলো পড়তে পড়তে লীলাবতীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের যেন একটা পথ খুঁজে পেয়েছিল কিশোর নীল। সে বুঝেছিল, মানুষের সঙ্গে মানুষ একাত্ম হতে পারে ভাবনায়, চিন্তায়, মননশীলতায়, দৈহিক উপস্থিতি সেখানে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। পড়তে থাকা পাতাদের মাঝে সে যেন ঠাকুমাকে ছুঁতে পারত রোজ।

জ্যাঠামশাই অসীম শ্যামাপদের কেজো ধাত পেয়ে কোর্ট-কাছারি নিয়ে মশগুল থাকলেও, অনন্তর ধারাটা লীলাবতীর দিকে। কর্পোরেশনের বাঁধা চাকরি অন্নচিন্তা দূর করায় নীলের বাবা আর একটি কাজই মন দিয়ে করে থাকেন – বই পড়া। নানা বিষয়ের অনেক বই আছে তাঁর। কিছু পাড়ার লাইব্রেরী থেকেও নিয়ে আসেন। এতে নীলের সুবিধা খুব। বই পড়া তার নেশা। গোগ্রাসে সে গিলে ফেলে সব বই।

নীল এখন যাবে বেহালা রায়বাহাদুর রোডে, সরোজ স্যারের বাড়ি। সরোজ স্যার এক অদ্ভুত মানুষ। এক সময়ে শ্যামপুকুর স্ট্রিটে থাকতেন। বাংলা পড়াতেন শৈলেন্দ্র সরকারে আর দুবেলা কোচিং ক্লাস। স্কুলে নীল বড় ভালোবাসত এই মানুষটাকে। স্যারের পড়ানোর ধরণে ও দখলে স্পষ্ট বোঝা যেত যে বাংলা ভাষা আর সাহিত্য তিনি সত্যিই ভালোবাসেন। নীল যখন ক্লাস টেনে, রিটায়ার করে যান সরোজ স্যার। বেহালায় একটা বাড়ি করেছিলেন, সেখানেই চলে যান। নীল অবশ্য যোগাযোগ বন্ধ করেনি কখনও। তার ভালো লেগেছে মানুষটার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকতে। আজ অবশ্য সে চলেছে এক বিশেষ কারণে। গত কয়েক বছর ধরে মনের কোণে একটা স্বপ্ন পুষছে নীল। আজ তার সেই স্বপ্নপূরণের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখবার পালা।

বাসে জানালার ধারে সিট পেয়ে মনটা খুশী হয়ে গেল। জানালার ধার বড় প্রিয় নীলের। বাইরের চলমান, পরিবর্তনশীল পৃথিবীটা দেখতে খুব ভালো লাগে তার। মনে হয়, নানা দৃশ্যপট যেন সিনেমার মতো স্থান করে দিচ্ছে একে অপরকে। নীলের মনে ভাবনারাও তাল মিলিয়ে চেহারা বদলাতে থাকে এইসব সময়ে। আজ তারাতলা পেরোতেই চিন্তার যোগসূত্র ছিঁড়ে গেল নীলের। সন্ধ্যার সময়ে গমগম করতে থাকে তারাতলা। মানুষের বসতি ও নগরায়ণ পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এখানে। কিন্তু আজ যেন বড় চুপচাপ, বড় শুনশান গোটা অঞ্চলটা। বেশ কিছু পুলিশ নজরে পড়ল নীলের।

ট্রামডিপো আসতে বাস থেকে নামল নীল। এখানটাও থমথমে। যাঃ ! লোডশেডিং হয়ে গেল। সরোজ স্যারের বাড়ি বেশী দূরে নয়, কয়েক মিনিটের পথ। সদর দরজা এই ভরসন্ধ্যাতেও নিয়মমাফিক আধ ভেজানো। বাইরের ঘরে স্যারের গলা পেল নীল। ঘরে একটা কাঠের টেবিল, মোমবাতি জ্বলছে তার ওপর। স্যার টেবিলের একদিকে চেয়ারে বসা, দরজার দিকে পিঠ করে বেঞ্চে বসা একটি মেয়ে। হালকা আলোয় মুখটা ঠিকমতো ঠাওর করা যাচ্ছেনা, তবে মনে হয় নীলেরই বয়সী।

"আয় নীল আয়। বোস। দেরী করলি, ভাবলাম আসবিই না বোধহয়"। "তা হয় স্যার ? আজ আসবোনা ?", নীল হাসতে হাসতে একটু দূরে রাখা একটা চেয়ারে বসে পড়ে। "বেশ, বেশ। আচ্ছা শোন, চিঠিটা লিখে উঠতে পারিনি বুঝলি। দাঁড়া লিখে দিচ্ছি এখনই। পরশু বারোটা নাগাদ চলে যাবি আনন্দবাজার অফিসে। ও মোটামুটি ওই সময়ে এসে যায়। চিঠিটা দেখাস, তারপর তোর যত প্রশ্ন আছে করে ফেলিস সুনীলকে"। "সুনীল ! মানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ?" রিনরিনে স্বরে কথা বলে ওঠে মেয়েটি। নীলের বড় ভালো লাগে গলাটা শুনতে। " হ্যাঁ রে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু আর এই নীল ওর নামে পাগল। যবে থেকে শুনেছে সুনীল আমার বন্ধু, আবদার জুড়েছে ওর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হবে। অনেকদিন না না করছিলাম, তারপর ভাবলাম দেখাটা করিয়েই দিই বরং", সরোজ স্যার হাসতে হাসতে বললেন। নীল আর সরোজ স্যারকে অবাক করে মেয়েটা বলে উঠল, "স্যার, আমিও যাব"। " তুই ?" "আসলে আমিও ওনার খুব ভক্ত স্যার। খুব ইচ্ছা একবার দেখা করি ওনার সঙ্গে। যদি কোনও অসুবিধা না হয়, তবে ...."। "না, অসুবিধা আর কি ? চিঠিতে দুজনের কথা লিখে দিচ্ছি বরং। কি রে নীল, তোর অসুবিধা আছে ?"

নীল একটু থতমত খেয়ে যায়। এ আবার কি বিপদ ! চেনেনা, জানেনা এই মেয়েটাকে নিয়ে সুনীলের সঙ্গে আলাপ করতে যাওয়া। নীলের খুব ইচ্ছা ছিল একটু আলাদা ভাবে কথা বলবে। সে কোনওমতে বলল, "ঠিক আছে"।

"চেয়ারটা টেনে এদিকে নিয়ে আয়। তোদের আলাপ করিয়ে দিই", সরোজ স্যার বললেন, "শিঞ্জিনি, এ হল নীল, আমার খুব প্রিয় ছাত্র। আর নীল, ওর নাম শিঞ্জিনি রায়, তোদের দিকেই থাকে, পাইকপাড়ায়। আমার কাছে পড়ত আগে। এখনও সময় পেলেই চলে আসে।" শিঞ্জিনির দিকে চোখ তুলে তাকিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল নীল। এ কার চোখ দেখছে সে ? এ চোখ তো তার চেনা। সুনীলই চিনিয়েছেন তাকে। যতবার নীরার কথা পড়েছে, যতবার কল্পনা করেছে সুনীলের নীরাকে, এ চোখই তো দেখেছে সে। বড় চেনা এ চোখ তার। শিঞ্জিনিও বিস্মিত হয়ে দেখতে থাকে নীলকে। এমনও হয় ! এ চোখই তো সে কাল সন্ধ্যাবেলায় দেখল, তারপর সারারাত। এই চোখ, হ্যাঁ, ঠিক এই চোখই তো তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে ওই

কবিতা। সময় যেন হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। যেন পা ফেলতে ভুলে গেছে সে। যেন আর না চলবারই কথা তার। ঘোর কাটে সরোজ স্যারের কথায়", এই নে, চিঠি লিখে দিয়েছি। পরশু চলে যাস দুজনে। নীল চিঠিটা নিয়ে একটা ঘোরের মধ্যে দরজার দিকে এগোয়। অভ্যাস মতো প্রণাম করতেও আজ ভুলে যায় সে। সরোজ স্যার পিছু ডাকেন, "নীল শোন, আজ পাড়ার পরিস্থিতিটা ভালো নয়", নীলের মনে পড়ে যায় আসবার পথের থমথমে অবস্থাটা। স্যার বলতে থাকেন, "পলিটিক্যাল ঝামেলাটা খুব বেড়েছে এদিক ইদানীং। আজ তো খুব গন্ডগোল চলছে দুপুরের পর থেকে। আমি বলি কি, শিঞ্জিনি তোর সঙ্গেই যাক বরং। কি রে শিঞ্জিনি ?" শিঞ্জিনি মাথা হেলায়। "আসুন", মৃদু গলায় শব্দটা উচ্চারণ করে অন্ধকার রাস্তায় পা রাখে নীল।

(চলবে)

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে।

স্বর্ভানু সান্যাল

পর্ব ৮

লাইকলাভ

ছোটবেলায় যারা রাশিফল দেখতেন তারা “স্ত্রী ভাগ্যে ধনলাভ” কথাটা শুনে থাকবেন। তখনকার দিনে স্ত্রীর ভাগ্যে অর্থাগম হত কিনা জানিনা, এখনকার দিনে প্রাডা, ম্যাক, বারবারা-দের বর্বর আক্রমনে সে সমীকরণের সত্যনাশ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ধনলাভ তো দূরের কথা, স্ত্রী যখন শপিং নামক ভয়ানক অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে যায় তখন আপনার যথেষ্ট এবং যথেচ্ছ ধনক্ষয় হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা। স্ত্রীভাগ্যে ধনক্ষয় হলেও আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করি কারণ স্ত্রীয়ের মুখে কল্যাণময়ী হাসি দেখে হৃদয় দ্রব হয় না এমন পাষাণ হৃদয় কোন পাষণ্ডর ? আবার পুরুষদের মধ্যে যারা আরও একটু দুর্ভাগা, যাদের মাঝে মাঝে অল্প বিস্তর প্রেমে পড়ার বদ অভ্যেস আছে তাদের আবার পরস্ত্রী ভাগ্যেও কিছু কিছু কষ্টার্জিত ধনসম্পদ খোয়া যায়। তার ওপর ধরা পড়লে মান মর্যাদা আর সেরকম জাঁদরেল বৌ হলে একপাটি কানের মত মূল্যবান জিনিস খোয়া যেতে পারে কিম্বা বিবাহবিচ্ছেদ ও ভরণপোষণ বাবদ প্রভূত অর্থ ব্যয়। ক্ষতির অঙ্ক খতিয়ে না দেখে যদি লাভের অঙ্ক দেখতে চান তাও অনেকরকম আছে। তার মধ্যে যেমন একটা ধরুন বৈবাহিক বন্ধনে নিজেকে না বাঁধতে পারলে বিবাহিতদের পার্টিতে কিছুতেই চট করে জায়গা করতে পারবেন না। তার ফলে আপনি হাট্টিমাটিমটিমের মাঠে-পাড়া-ডিমের-ডালনা কি ছাগলের-ছদ্মবেশী-কারী কি আমের-আম্মোহনী-চাটনি এরকম বাবার-জন্মে-না-শোনা-ডিশ খেতে পারবেন না। বেনুদির কিচেন কিম্বা সুদীপার রান্নাঘরের ছোঁয়া লেগে এমনতর রান্না করার ছোঁয়াচে রোগ এখন গৃহস্থ বাঙালির ঘরে ঘরে। কিন্তু দুঃখের কথা বেনুদি কি সুদীপারা এখনও কুমার কুমারীদের সেভাবে পকটস্থ করতে পারে নি। তাই তাদের সপ্তাহান্তে বিয়ার সহযোগে মুরগির ঝোল আর ভাত খেয়ে জীবন কাটাতে হবে। বিয়ে করার ইত্যাদি নানাবিধ সুবিধে থাকলেও যে সুবিধার কথা বলতে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি সেটা অন্য। সেটা হল স্ত্রী ভাগ্যে আজকাল ধনলাভ না হলেও অতি অবশ্যই আপনার ফেসবুক লাইকলাভ হবে। অর্থাৎ কিনা রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠবেন। বন্ধুদের সত্যিকারের পছন্দের তালিকায় আপনি যতই লাস্ট বেঞ্চার হন না কেন, জনপ্রিয়তার জোয়ারে ভাসবেন যদি একটি কাজ করেন। সেটি হল ফেসবুকে স্ত্রীসঙ্গে আসুন। সীতা অপহরণের পর বিলাপ করতে করতে শ্রীরামচন্দ্র বলেছিলেন “সীতা ছাড়া আমি যেন মণি হারা ফণী”। আজকের দিনে জন্মালে অবশ্য ফেসবুকে সীতাদেবীকে ট্যাগিয়ে বলতেন “মাই লেডি লাভ ইজ মিসিং। ফিলিং ডিপ্রেসড...”। কিন্তু সে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে আজকের দিনে বলা যায় “লাইক কর্ম লাইক ধর্ম লাইক চিন্তামণি। লাইক ছাড়া আমি যেন মণি হারা ফণী।” জীবনে লাইকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বেসিকালি ফেসবুক-ইনষ্টাগ্রাম ইত্যাদি গুরুত্বপুর্ণ সফটওয়াররা আমাদের শৈশব ধরে রাখতে সাহায্য করে। কেন বলছি ? যেমন ধরুন আমার আড়াই বছরের মেয়ে। তাকে ডাইপার ছাড়িয়ে পটি সীটে বসিয়ে পটি করানোর চেষ্টা চলছে। প্রত্যেকবার সে কাজে সার্থক হলেই সে বলবে “মাম্মা বল। বাবা বল।” অর্থাৎ কিনা সবাইকে “গুড জব” বলতে হবে এবং হাততালি দিতে হবে। বাবা অফিসে গেলে সে দাবী জানায় “ফোনে বল।” অন্যায় দাবী সন্দেহ নেই কিন্তু ওর সাথে তর্ক করতে গেলে যেকোন তর্কালঙ্কার বাচস্পতিও ফেল করে যাবে কারণ একটু পরেই ও কেঁদে নিজের স্কোর বাড়িয়ে নেবে। অতএব বাবাকেও কোন গুরুত্বপুর্ণ ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যালগরিদম লেখা থামিয়ে ফোনে “গুড জব” বলতে হয়। মানে ব্যাপারটা হল লাইক পাওয়ার ইচ্ছে। তারিফ পাওয়ার ইচ্ছে। সেই ইচ্ছেটাকে আমল দিয়েই ফেসবুকেদের রমরমা ব্যবসা। আমার তো মনে হয় ওরা শিশুদের জন্য একটা কিডিবুক বের করতেই পারে যেখানে মিয়া, সানাই, পিকু, হৃদুরা পটি পার্টি করতে পারে, অর্থাৎ পটিতে বসে পটি করে ছবি লাগিয়ে লাখো লাইক কুড়োতে পারে। মোটের ওপর ব্যাপার হল আমাদের সকলের মধ্যেই থাকে শিশু স্বত্তা বা শিশুসুলভ “লাইকড” হওয়ার ইচ্ছে। কিন্তু চাইলেই পাচ্ছেন কোথায় ?

যেমন ধরুন আমি। আমি ভয়ানক অসামাজিক জীব (মানে আনসোশ্যাল। অ্যান্টিসোশ্যাল নই। অ্যান্টিসোশ্যাল-এর তর্জমা বোধ হয় সমাজবিরোধী। ঠিক জানিনা। বাংলায় আমি বরাবরই কাঁচা। মাধ্যমিকে কোনক্রমে চৌষট্টি পেয়েছিলাম)। তো এ হেন আমি যে কিনা নিজের লেখা লাগালে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে পাঁচ-দশ আর নিজের একার ছবি পোষ্ট করলে ঐ গোটা কুড়ির মধ্যে স্কোর করি মানে ওই কটি লাইক পাই আর কি, সেই আমি-ই স্ত্রী-এর সাথে ছবি পোষ্ট করলে পুরো ঝিঙ্গা-লা-লা কেস। পঞ্জি স্কিমের মত পুরো দশ গুণ রিটার্ন। এক ধাক্কায় কুড়ির থেকে দুশো। অ্যাসটেরিক্স কমিকসে সেই গল-রা মাঝে মাঝে পাওয়ার পোশান খেয়ে কিছুক্ষণ হুরুদ্দুম মারপিট করতে পারতো, অনেকটা সেরকম। ঘন্টাখানেক অন্য সব "feeling mortified", "feeling beatified" টাইপ পোষ্ট-এর সাথে যুদ্ধ করে সক্কলের টাইমলাইনে প্রথমে থাকবে আপনার পোস্ট। ব্যাস ফলস্বরূপ দুশো লাইক। গোটা বিশেক কমেন্ট-ও পেয়ে যাবেন শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে। ছবিতে স্ত্রীকে সঙ্গে রাখলে হবে এমনতর অভুতপূর্ব লাইক ও কমেন্ট লাভ। একেই বলে নারীশক্তি বা উইমেন পাওয়ার। শাস্ত্রে নারীকে শক্তি কেন বলেছে এবারে বুঝতে পারছেন তো ? আপনার শিশু কন্যার সাথে ছবি লাগালেও বাজার পাবেন। রোববার সকালের লুচি-আলুর চচ্চড়ির মত পাতে পড়ার আগেই উঠে যাবে বিদ্যুৎগতিতে। মায়ের সাথে ছবি লাগিয়ে "হ্যাপি মাতৃদিবস" ক্যাপশান দিলেও ফুটেজ পাবেন কিন্তু সেটা ছেলেদের খুব একটা করতে দেখিনা। মায়ের কথা মনে পড়লে ছেলেদের বোধ হয় ফেসবুকের থেকে বেলনার বাড়ির কথাই বেশি মনে পড়ে। ছোটবেলায় পড়াশুনো করানোর জন্য বেয়াড়া রকমের জোরাজুরি করার জন্যই আমার স্থির বিশ্বাস ছেলেরা ফেসবুকে মায়ের সাথে ছবি লাগায় না। মোট কথা হল, আপনার ডিজিট্যাল জনপ্রিয়তা বাড়াতে ছবি তুলুন এবং সে ছবিতে বাড়ির কোন একজন প্রিয় নারীকে সঙ্গে রাখুন এবং একটা ঝাক্ক্যাস ক্যাপশান সহ ফেসবুকে পোষ্টিয়ে দিন। মা স্ত্রী কন্যা কেউ একজন থাকলেই হল। স্ত্রী হলে তাঁকে ট্যাগাতে ভুলবেন না। কিন্তু মনে রাখবেন নিজের বাড়ির মধ্যেই থাকবেন। অন্যের বাড়ির কোন নারীর সাথে ফেসবুকে দেখা গেলে, এমনকি কোন অন্যপূর্বার কাছাকাছি দেখা গেলেও বাড়ির মধ্যে ছাদ ফুটো না হয়েই আপনার বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টিতে ভেজার সম্ভাবনা।

[প্রথমে ভেবেছিলাম বলা অপ্রয়োজন কিন্তু নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের সেন্স অব হিউমার যেভাবে কমে যাচ্ছে তাতে রোজগেরে এবং বেরোজগেরে গিন্নিদের উদ্দেশে ডিসক্লেমার দিয়ে রাখি এটা নেহাতই মজার ছলে লেখা, কোন নারীবিদ্বেষজনিত নয়। This reductionist approach is just to produce humor]

স্বর্ভানু সান্যাল – জন্ম হাওড়ার রামরাজাতলায়। ছাত্রজীবন কেটেছে পুরুলিয়া, হাওড়া ও দুর্গাপুরে। কর্মজীবনে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরিসূত্রে বিভিন্ন দেশ ঘুরে শেষ নয় বছর আমেরিকার শিকাগোয় কর্মরত। পেশাদারি এবং পারিবারিক জীবন বাদ দিলে, তার অনেকটা সময় কাটে সাহিত্যচর্চা করে। অনুগল্প, রম্যরচনা, কবিতা, স্মৃতিকথা নিয়মিত লিখে থাকেন। ''যযাতির ঝুলি'' (https://jojatirjhuli.net) নামে তার ব্যক্তিগত ব্লগ আছে এবং সেই ব্লগ এর মাধ্যমে তার লেখা নিয়মিত পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেন। ব্লগটি বেশ জনপ্রিয় এবং সেটির সাথে লিঙ্কড একটি ফেসবুক পেজও আছে (https://www.facebook.com/jojatirjhuli)। প্রতিটা লেখকের মধ্যেই বাস করে তার লেখার এক চরম ও নির্দয় বিচারক। স্বর্ভানুর বিচারে সে সাহিত্য সাগরের ধারে বসে শুধুমাত্র নুড়িই কুড়িয়েছে। অন্য শখের মধ্যে আছে বেড়ানো, ফটোগ্রাফি, গান শোনা। আর অবশ্যই কারণে অকারণে একটু গড়িয়ে নেওয়া।

পবিত্র চক্রবর্তী

ডায়েরীর পাতায় ট্যানিফ্লোরাম রোডিওলা

(১)

বিখ্যাত নন্দী বাড়ীতে যাতায়াত সেই ছোট্ট থেকেই। এখানে বলে রাখি নন্দী পিসো দূর সম্পর্কের আত্মীয় হলেও নিজের পিসোর চেয়ে কম আদর করতেন না। উনি বছরখানেক হল গত হয়েছেন। এখন পিসির আদর খাওয়া আর মাঝে মধ্যে গিয়ে খবরাখবর নেওয়া আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে গেছে। যাকগে, কাজের কোথায় আসি। পিসির ফোন পেয়ে পরদিন সকালে আমার কাজ সেদিনের মত মুলতুবি রেখে বাইকে চেপেই রওনা হলাম ।

জানুয়ারি মাসের ঠাণ্ডা জমিয়ে পড়েছে এবার। তাই পৌঁছাতে একটু দেরী হল। সকালের জলখাবার রাজকীয় ভাবে সারার পর পিসি আমাকে একটা চামড়ায় মোড়া ডায়েরী গোছের খাতা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, “টুনু এটা তোর পিসোর। আমি সেদিন ওর বইপত্তর ঝাড়াঝাড়ি করতে গিয়ে একটা চিঠি পাই ....। “জিজ্ঞাসু মুখ করে তাকিয়ে থাকতেই আমার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, “ওটাতে তোর নাম লেখা আছে, একবার পড়ে দেখিস।”

স্নেহের টুনু, তারিখ – ০৬-১২-১৭

দুটি গাছের ফুল থেকে ওষুধ একটা বানাই। যার পোশাকি নাম ট্যানিফ্লোরাম রোডিওলা; এতে মানুষের আয়ু কয়েকগুণ বেড়ে যাবে । এই ওষুধের প্যাটেন্ট একমাত্র আমিই জানি আর জানে প্রোফেসর ডোনাল্ড। উনি দ্য সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কে দীর্ঘকাল ভারতীয় ভেষজ নিয়ে গবেষণা করছেন ।

আমার আবিষ্কারের বিষয়ে উনিই প্রথম আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। অন্যদের মত প্রোফেসর ডোনাল্ড এই বিষয় জানলেও তৈরী করার প্রণালী জানেন না, জানতে চানও নি। আমি ওর কাছে ৬ লাইনের একটা ধাঁধাঁ রেখে গেছি। আমার কিছু হলে নিজের পরিচয় দিবি আর তোর পিসির কাছে একটা চাবি আছে যা তোকে সাহায্য করবে, ওটা নিবি। ভালো থাকিস ।

তোর পিসো

ডঃ বঙ্কু বিহারী নন্দী

পুনশ্চ ঃ- ধাঁধাঁ সমাধান করতে পারলে তুইই হবি তার উত্তরাধিকারী ।

(২)

আমি রোহিতাশ্ব রায়, প্রাণী বিদ্যায় ডক্টরেট শেষ করে কলেজে এক বছর হল জয়েন করেছি । বন্ধুরা সংক্ষেপে রোহিত বলে ডাকে। এত তাড়াতাড়ি নিউ ইয়র্কের ভিসা পাওয়া মুশকিল, তবে পেলাম কিছুদিনের টুরিস্ট ভিসা। আগেভাগে প্রোফেসর ডোনাল্ডকে বিষয়টা সংক্ষেপে জানিয়েছি। তার উদার মনের পরিচয় পেলাম তখনই যখন জানালেন “মাই ডিয়ার কাম সুন অ্যান্ড স্টে উইথ মি। আমারও বয়েস হয়েছে যথেষ্ট, জাস্ট ফুলফিল দ্য ড্রিম অফ ইউর আঙ্কেল ....।”

আগে কোনদিন বিদেশের মাটিতে পা দেয়নি। কলকাতা থেকে জেট এয়ার ভায়া মুম্বাই হয়ে দীর্ঘ বারো হাজার কিলোমিটারের পথ পাড়ি দিয়ে যখন জন এফ কেনেডি বিমান বন্দরে নামলো তখন নিউ ইয়র্কে গোধূলির লালিমা।

প্রোফেসর ডোনাল্ড গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন । চেকিং পর্ব শেষ করে বাইরে আসতেই দেখি একটা হাত আমার ছবি আর নাম লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে অপেক্ষা করছে। পরিচয়ে জানলাম দীর্ঘদেহী ছেলেটি আফ্রিকান-আমেরিকান। সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের এক অতি উন্নত শহরের বুকে দাঁড়িয়ে ছেলেটির নামটা শুনে বেশ তাজ্জব হলাম, অ্যাবিনুশ। মজা পেলাম মনে মনে, মনে হল খুব কাছের একজন মানুষকে পেয়ে গেছি। আমি মুচকে হেসে বললাম, "তোমাকে অবিনাশ বলে ডাকলে অসুবিধা নেই তো?" "নো স্যার ইউ মে ...." সংক্ষিপ্ত কথার মাঝেই গাড়ী স্পীড তুলল । গাড়ী চালাতে চালাতে অবিনাশ জানালো, "আপনি তো লেট প্রোফেসর ব্যাঙ্কুর আত্মীয়, হি ওয়াস মাই ডিয়ার পারসন। ভীষণ নলেজ। স্পেশালি যখন আফ্রিকান-আমেরিকানদের ইতিহাস ও অত্যাচার নিয়ে বলতেন তখন মনেই হত না যে উনি বিজ্ঞানের মানুষ।"

কথাটা ভুল বলে নি অবিনাশ। এই দেশে কালো আর সাদার পার্থক্য অনেকটাই প্রকট হয়েছিল। পিসো একবার গল্প করতে করতে বলেছিল ১৯২০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত আমেরিকার পাবলিক সুইমিং পুলে কালোদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল । পরবর্তীকালে ষাট ও সত্তরের দশকে জন কেনেডি, রিচার্ড নিকসন এবং রোনাল্ড রিয়েগান রাষ্ট্র নায়কদের প্রচেষ্টায় এই ঘৃণ্য বিভাজন বন্ধ হয় ।

ঘড়িতে দেখলাম প্রায় আটত্রিশ মিনিট অতিক্রান্ত । লোয়ার ম্যানহাটন ক্রশ করে খানিকটা এগোতেই লিওন্যার্ড স্ট্রিট । গন্তব্যে এসে গেছি । অভ্যর্থনা জানালো মিসেস নালা, প্রোফেসর রোনাল্ডের কেয়ারটেকার। বছর পঞ্চান্নর মহিলা মিষ্টি হেসে আমাকে ভিতরে ডাকলেন এবং জানালেন প্রোফেসর হাডসন নদীতে মাছ ধরতে গেছেন, খানিক পরেই চলে আসবেন। কথায় কথায় ভদ্রমহিলা জানালেন অ্যাবিনুশ তারই ছেলে, পড়াশনায় ভালো। এখানকার প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ।

(৩)

বেশ শীত এখানে। প্রোফেসর সখের মাছ ধরে চলে এসেছেন কিছুক্ষণ আগেই। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ডিনার খেতে খেতে প্রোফেসর বললেন, "ওয়েল মাই বয় উই উইল টক টুমারো .... এখন ফুল রেস্ট নাও।" দেখলাম খানিক ন্যুজ হয়ে গেছেন বয়েসের ভারে ।

ঘুম ভাঙল খানিক বেলা করেই। ঝকঝকে নীলাকাশ। বাংলো টাইপের ঘরের সামনেই সবুজ গালিচার মত ঘাস। সামনের চেয়ারে গিয়ে বসতেই প্রোফেসর নিজের হাতে কোকো বানিয়ে দিলেন। স্বাদটা বেশ তিতকুটে কিন্তু ঠাণ্ডার জন্য ভালো। আমার মুখের অবস্থা দেখে বৃদ্ধ হো হো করে হেসে ফেললেন। হাসি থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের মুখে চা সেট করে গেছে, তোমার পিসোও পছন্দ করতেন না জানো। বাই দ্য ওয়ে যে কারণে তোমার আসা ....।"

আমি মাঝ পথেই বললাম, "স্যার, ওটা আসলে কী? কারণ ওই নামে তো সায়েন্সে এখনো কিছু নেই!"

– "আসলে ওই লিকুইডটা দুটো ভারতীয় ভেষজের অদ্ভুত মিশ্রণ। তোমাদের পরিচিত অথচ তিনি এমন এক জৈব আবিষ্কার করলেন যা তার মতে মানুষের আয়ু বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে।"

– কোন পরীক্ষা করেছিলেন? না, অনুমান! কারণ আমি যতদূর জানি টেলোমারেস আয়ু বৃদ্ধির জন্য অনেকটাই দায়ী।"

– "রাইট মাই ডিয়ার। প্রোফেসর মল্লিক ইঁদুর, ড্রসোফিলা জাতীয় একধরণের মাছির দেহে ট্যানিফ্লোরাম রোডিওলার লিকুইড ইঞ্জেক্ট করে সুফলও পান।"

বৃদ্ধ ডোনাল্ড চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন, "ভাবছো মানুষের দেহে প্রয়োগ হয়েছে কিনা তাই তো !" আমি ওনার দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলাম। প্রোফেসর বাঁধানো ঝকঝকে দাঁতে এক টুকরো হাসি হেসে বললেন, "মাই বয় তোমার পিসোর ইচ্ছা ছিল এই পরীক্ষাটা আমার উপরে করার কিন্তু" কথাটা না শেষ করেই আকাশের দিকে আঙুল দেখালেন ।

– "আপনি কী চান স্যার ?"

– "আমি । তুমি করতে পারবে আমার উপর ? দেখো যদি আরও কিছু বছর বেঁচে যাই।"

কথাতে এতটাই মশগুল যে খেয়াল করি নি অবিনাশ এসে হাজির। চোখাচোখি হতেই অবিনাশ হাতে রাখা ব্রেকফাস্টের ডিশ দুটো টেবিলের উপর রাখলো। বুঝলাম ও খানিক আগেই এসেছে কিন্তু কথার মাঝে কোন বাধা দিতে চায় নি। অথচ আমার মনের মধ্যে কেন জানি না ওর উজ্জ্বল চোখ দুটো বারবার ঘুরেফিরে আসছিলো। প্রোফেসর ডোনাল্ডের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "আজ বাইরে যাবেন তো, গাড়ী কী রেডি করবো ?"

প্রোফেসর কথার ঘোরে ছিলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, "উমম্ কিছু বললে .... হ্যাঁ .... না আজ বরং বাদই দাও। কেন জানি না কদিন ধরে শরীরটা ঠিক যাচ্ছে না।"

"ওষুধটা খেয়ে নিন ভাল লাগবে "বলেই অবিনাশ নিজের পকেট থেকে কালচে গোল ট্যাবলেট বার করে দিল। প্রোফেসরের চোখেমুখে একটা বিরক্তির ছাপ, "ইটস্ নট ওয়ার্কিং, ডাক্তার ডাকো।" বলেই বৃদ্ধ নিজের ছড়িতে ভর করে ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। খানিকটা গিয়েই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ডিয়ার আজ রাতে কিন্তু করতেই হবে।" প্রোফেসর চলে যেতে আমি অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা কী ওষুধ ?"

"স্যার এটা ভেষজ ট্যাবলেট বাট .... ওকে আই উইল কল ডক্টর।" কথাটা সেরে খানিকটা ক্ষোভের সাথে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বাইরে বেরিয়ে গেল লোহার পেল্লাই দরজা খুলে। আমিও একটু অবাক হলাম ওর ব্যবহারে, অদ্ভুত পরিবর্তন ।

(৪)

প্রোফেসর সেই রাতে আরও দুর্বল হয়ে পড়লেন। ডাক্তার আসলেন কিন্তু ঠিক ধরতে পারলেন না। তিনি বারবার তাকে ভর্তি করার কথা বলেও রাজী করাতে পারলেন না, অবশেষে কয়েকটা ওষুধ লিখে দিলেন। প্রোফেসরের চোখ দুটো বন্ধ, গায়ের রঙ ফ্যাকাসে কালচে। অবিনাশ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল ডাক্তারকে। মিসেস নালা আফসোসের সুরে আমাকে বললেন, "ওর এই একটা সমস্যা, কিছুতেই হসপিটালে ভর্তি হতে চান না। শরীর খারাপ করলেই অ্যাবিনুশকে নিজের ল্যাবরেটরি থেকে ওষুধ আনতে বলেন আর সেটাই খান।"

শুনে আমি বললাম, "মিসেস নালা মে আই সি দ্য ল্যাবরেটরি প্লিস।" মাথা নাড়িয়ে ভদ্রমহিলা সম্মতি প্রকাশ করলেন। আমি তার পিছু পিছু কয়েকটা ঘর ছেড়ে খানিকটা দক্ষিণ দিকের অপেক্ষাকৃত বড় একটা হল ঘরে ঢুকলাম। মিসেসে নালা আমাকে ল্যাবরেটরি দেখিয়ে বেরিয়ে গেলেন। নানান যন্ত্রপাতিতে ঘর ঠাসা। হঠাৎ একটা বয়ামের দিকে আমার নজর যায়। কাছে গিয়ে দেখি ভিতরে একটা সন্দপ লবণের মত একটা সাদা স্ফটিক। কাঁচের উপর লেখা – পিউরিন মিথাইল জ্যান্থিন এলকালয়েড। এ যে ক্যাফিন ! আকস্মিক প্রোফেসরের ক্ষীণ আর অ্যাবিনুশের চীৎকারে ছুট লাগালাম। বেডরুমের দরজা হাট করে খোলা। মিসেস নালা অ্যাবিনুশের একটা হাত ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। খাটের নীচে মোটা গালিচার উপর পরে আছেন প্রোফেসর। দৃশ্যটা দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। সেদিনের সেই শান্ত ছেলেটির চোখ দুটো লাল, শরীরে মনে হচ্ছে কোন আড্ডুত প্রাণী ঢুকে ওকে হিংস্র করে ফেলেছে। কিন্তু ওটা কী ডান হাতে ? কাছে যেতেই লক্ষ্য

করলাম একটা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, তাতে হাফ কালচে সবুজ তরল। অবিনাশ পড়ে থাকা প্রোফেসরের শরীরে সিরিঞ্জটা ঢোকানোর জন্য হাঁটু গেড়ে ঝুঁকে পড়লো। আমি মুহূর্তের মধ্যে ওকে সজোরে একটা ধাক্কা মারতেই অত বড় শরীরটা ছিটকে পড়ল কাঁচের টেবিলের গা ঘেঁষে ।

অশতিপর প্রোফেসরকে হাত দুটো ধরে বেশ কষ্ট করে বিছানার উপর বসালাম। ওর মুখে চোখে এখনও একটা আতঙ্কের ছায়া। অদূরেই মাথা গোঁজ হয়ে বসে ছিল অবিনাশ। আমি ওর দিকে এগিয়ে ঝাঁঝিয়ে বললাম, "জানো এর জন্য তোমার জেল হতে পারে ! আর আমি পুলিশ ডাকবোই।"

অদ্ভুত ব্যাপার পুলিশের কথা শুনেও অবিনাশ চোখে কোন ভয়ের লেশমাত্র দেখতে পেলাম না বরং শান্ত ভারী গলায় বলল, "ইউ মে স্যার । আমি আমার প্রটেষ্ট করবোই।"

"কিসের প্রটেষ্ট ? একজন বৃদ্ধ মানুষকে আঘাত করে কোন আন্দোলন হয় না, আদালত তোমার এই অনুভূতির কোন মুল্য দেবে না।"

"লিভ হিম মাই বয়। ওর এই রাগ অনেককালের। আর এর জন্য দায়ী আমাদের সাদা চামড়ার আমেরিকানরাই। একটা সময়ে ওদের আমরাই বঞ্চিত করেছিলাম। ও যখন ছোট ছিল তখন ওর বাবা মারা যান। কারণ কী জানো ?"

আমি মাথা নাড়িয়ে না জানালাম। প্রোফেসর বললেন, কালো চামড়ার কয়েকজন সুইমিং পুলে নেমেছিল কিন্তু তারা আর উঠতে পারে নি। মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিষ। আর যারা উঠেছিল তাদের কয়েকজন পক্ষাঘাতে তিলে তিলে বেঁচে থাকে। মৃতদের মধ্যে ওর বাবাও ছিল।" এত কথা বলার পর প্রোফেসর ডোনাল্ড হাঁপাতে থাকেন। মিসেস নালা তার মাথার কাছে বসে সাদা চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন ।

"অবিনাশ কী ছিল তোমার সিরিঞ্জে, তাড়াতাড়ি বল। কী ইঞ্জেক্ট করেছো ?"

"আমি বলি, ওটা ছিল হাই ডোজের ক্যাফেন। ব্যাথা কমার জন্য আমি ওকে মাঝে মধ্যে ঠিক মাপ করে দিতে বলতাম কিন্তু আজ ..." কথাটা বলে প্রোফেসর অ্যাবিনুশের মুখের দিকে তাকায়।

"আই এম সরি ড্যাড" কাঁদতে থাকে অ্যাবিনুশ ওরফে অবিনাশ ।

আমার অবাক হওয়ার পালা। এতক্ষণ পর মিসেস নালা মুখ খোলেন। ভদ্রমহিলার ঠোঁট তিরতির করে কাঁপছে "ওর বাবা মারা যাওয়ার সময় ওর বয়েস খুবই অল্প। পেট চালানোর জন্য প্রোফেসর ডোনাল্ডের কাছে আসি। উনি আমাদের আশ্রয় দিলেন এবং এক বছরের মাথায় আমাকে বিয়ে করেন। অ্যাবিনুশকে নামী স্কুলে পড়ানও। ওকে নিজেদের জাতির উপর ক্ষুব্ধ হতে আমি দেখেছি। উনি বলতেন এটা অন্যায় কিন্তু অ্যাবিনুশ নিজের অতীত কখনই ভুলতে পারে নি।"

অ্যাবিনুশের দিকে তাকিয়ে আমি শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, "যিনি তোমাদের এত উপকার করলেন তাকেই মারতে চাইলে ?"

অ্যাবিনুশ আমার দিকে হতাশা আর ক্ষোভ মেশানো গলায় বলল, "স্যার যখন শুনলাম ট্যানিফ্লোরাম রোডিওলার লিকুইড ইঞ্জেক্ট করে ওর আয়ু বাড়াবেন তখন নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলাম না। কারণ ওরা আমার বাবাকে হত্যা করেছে, ওকে আর বাঁচতে দেব না ।"

দিন সাতেক কাটানোর পর কলকাতার জন্য এয়ারপোর্টে এলাম। এখন আমার প্লেন মেঘের আস্তরণ কাটিয়ে চলেছে। না আমি সেই ওষুধের তৈরী করার প্রণালী নেয়নি। নির্দিষ্ট চাবি ঘুরিয়ে প্রোফেসর বার করেছিলেন সেই ধাঁধাঁর কাগজটি।

অ্যাবিনুশকেও আমি ডেকে নিয়েছিলাম। ও দেখার কিছুক্ষণ পরেই আমাকে অবাক করে উত্তর দেয়। প্রোফেসর আর মিসেস নালার কাছে আমি কৃতজ্ঞ কারণ তাদের ছেলে এনিংমাটোলজিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এতকাল বুক দিয়ে আগলিয়ে রেখেছিলেন কাগজটা। যাওয়ার সময় প্রোফেসরকে ডেকে বলেছিলাম যে সকল ব্ল্যাক আমেরিকার সেই শারীরিক ক্ষতির মুখে আজও মৃত প্রায় তাদের জন্য ওটা ব্যবহার করতে। আমি চোখ বন্ধ করে চিন্তা করতে লাগলাম সেই ধাঁধাঁটার –

"দেঁহু তুলসী এক রতি নারায়ণ হৃদে,
রাধা নাম গাহি পাপ মুকত ধরণীতে।
হনুমান আনি লেপিলো সাতেক রতি সঞ্জীবনী,
মৃত লক্ষ্মণ দেহে হইল লক্ষণ তীব্র এক জীবনী।
মুই অধম বঙ্কু টেলোমিয়ার বক্ষে,
সমুদ্র পারে রাখি গুপ্ত এক কক্ষে ।।"

পবিত্র চক্রবর্তী – ৩১শে অক্টোবর ১৯৭৭ সালে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে জন্ম, পড়াশুনা ও বড় হয়ে ওঠা। কবিতা দিয়ে সূচনা সাহিত্য জীবন, তারপর শিশু কিশোর এবং রূপকথার গল্প দিয়ে ভারত ও ভারতের বাইরের দেশে নানা পত্র পত্রিকায় লেখা ; ২০১৪ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''প্রেম ও কিছু কথা'' আত্মপ্রকাশ। ২০১৭ সালে ''কাব্য প্রভাকর'' ও ২০১৮ সালে ''কাব্যশ্রী'' উপাধী লাভ। ২০২০ সালে লেখকের কয়েকটি বই কোলকাতা বইমেলায় আসতে চলেছে। ভালোবেসে লেখা শুধু লক্ষ্য ।।

জয়দেব সাহা ও রুবাইয়া জেসমিন (জুঁই)

বিশ্বকবির বন্দনায় কার রূপ ? সে তো ঈশ্বর নয় !

“আমি কখনো-বা ভুলি, কখনো-বা চলি

তোমার পথের লক্ষ্য ধরে;

তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে

যাও যে সরে।”

একজন মানুষ কি এতটা কারও প্রতি একাত্ম হতে পারে ? আর সেই মানুষটা যখন কবিগুরু, তখন তো প্রশ্নটা আরও গভীর হয়। বিশ্বকবি যার আরাধনা করছেন, তার রূপ, তার অস্তিত্ব, তার উপস্থিতি বিস্ময়কর হতেই হয়। নাহলে কি আর সে'ই লেখা নোবেলের মতো পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয় ? প্রশ্নটা নোবেল নিয়ে নয়। প্রশ্নটা হল যাঁর আরাধনা কবি করেছেন, তাঁর রূপটা কেমন ছিল ?

কবি কার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে গেছেন ? বলেছেন –

“আমারে তুমি করিবে ত্রাণ

এ নহে মোর প্রার্থনা,”

আবার তিনি করুণ সুরে বলেছেন –

“অন্তর মম বিকশিত করো”

প্রশ্নটা হল কার কাছে এমন প্রার্থনা করা সম্ভব? আর এই প্রার্থনার সুরটাও বড় অদ্ভুত। কবি কিন্তু কিছু চেয়ে নেননি। নিজেই করতে চেয়েছেন সব, শুধু একটা আশ্রয় আর ভরসা চেয়েছেন। চেয়েছেন মানস অনুপ্রেরণা।

কবির সমস্ত কবিতাগুলোতে একটা উপলব্ধি ছেয়ে আছে। এই উপলব্ধি একদিনের নয় – এ নিয়ে কোন সংশয় নেই। তিনি যখন মাথানত করছেন তখন তার সামনে প্রকৃতির একটা বিস্ময় রূপ ফুটে উঠছে। ঠিক মহাভারতের যুদ্ধে যেমন অর্জুনের সামনে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। লক্ষ্য করার বিষয় হল সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের কথাগুলোতেও ছিল বিশ্বের সার্বজনীন কিছু সত্য। যেখানে প্রকৃতি তার বাহ্যিক রূপ-রস-গন্ধ হারিয়ে অথবা বলা যায় পেছনে ফেলে শক্তির অফুরন্ত একটা উৎস হয়ে উঠেছে। মহাভারত কিন্তু কোন ধর্মের প্রতীক একেবারেই না। মহাভারত একটা সাহিত্য। যে সাহিত্যে যেমন দর্শন উঠে এসেছে, তেমনই বিজ্ঞানও। আর এই দর্শন কেবল বাহ্যিক কোন ভাবনা নয়, একটা গভীর উপলব্ধি। হজরত মহম্মদও কোরানে ঠিক একই কথাগুলোকে বলেছেন। প্রকৃতিকে একটা শক্তি, নির্ধারক আর বলা যায় সচেতনতার একটা বিশাল সত্তার হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। কবিগুরুর গীতাঞ্জলীতেও ঠিক সেরকম কিছু একটা খুব প্রভাব বিস্তার করছে। তাহলে ভাবতেই হয় যে কোন সেই শক্তি যে বার বার কোনও না কোনও সাহিত্যিকের উপলব্ধিতে ধরা দিচ্ছে ? শুধু সাহিত্যিক নয়, বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও শেষ পর্যন্ত সেই উৎসটাকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বলেছিলেন –

“Everything is determined, the beginning as well as the end, by forces over which we have no control. It is determined for the insect, as well as for the star. Human beings, vegetables, or cosmic dust, we all dance to a mysterious tune, intoned in the distance by an invisible piper.”

তাহলে কি আমরা ঈশ্বরের গল্প করছি ? একদমই না। সে তো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এখানে প্রকৃতির রূপ স্পষ্ট ধরা যাচ্ছে যেখানে জীবনেরও স্বাদ আছে আর আছে ব্রহ্মাণ্ডের সকল সত্যের উদ্ভাবনা। এই প্রকৃতি প্রতিদিন আমাকে-তোমাকে ঘুম থেকে জাগায় আবার ঘুম পাড়িয়েও দেয়। তবে কেমন দেখতে সে? তাহলে কবির পথ ধরেই একটু এগোনো যাক।

রবিঠাকুর বলছেন –

"নিত্যকালের উৎসব তব, বিশ্বের দীপালিকা,

আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা

নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি।"

যদি প্রশ্ন হয় – কোন ইচ্ছার কথা বলছেন কবি, তাহলে হয়ত প্রশ্নটাই ভুল হয়ে যাবে। মহাবিশ্বের কোন কাজটা প্রকৃতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়েছে ? এখন একটা নৈরাশ্য কাজ করতে শুরু করবে ! তাহলে কি আমাদের কোন অস্তিত্ব নেই ? আমাদের হাঁটা-চলা এমনকি জীবনের প্রত্যেকটা ছোট-বড় সাফল্য-ব্যর্থতা, সবই কি আগে থেকেই ঠিক করা আছে ? আমরা তাহলে চিন্তা কেন করছি? আমাদের ভাবনাশক্তি তাহলে ভিত্তিহীন ! কবি কি একবারও তা বলেছেন ? তাঁর কাছে কিন্তু প্রকৃতির স্বরূপটাই আলাদা। তিনি বলছেন –

"জানি জানি কোন আদি কাল হতে

ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে।"

আসলে আমরা একটা জীবনের স্রোতে ভাসছি, যার শুরু-শেষ সবটাই প্রকৃতির কোলে। তাহলে আমরা কি প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন কোন সত্তা ? এই সর্বশক্তির উৎসটা কি আমাদের বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হয় ? নাকি আমরা নিজেরাও এর অবিচ্ছেদ্য অংশ ? আমাদের প্রতিটা কাজ, প্রত্যেক মুহূর্ত এই অসীমতারই অংশ। আমরা নিজেরাও এই শক্তির আধারের অবিচ্ছিন্ন রূপ। তাহলে যদি আমরাই সমস্ত কিছু হয়ে থাকি তাহলে কবি কার বন্দনা করছেন ? সেই infinite beingness-এর । আমরা তো একটা ক্ষুদ্রবিন্দু মাত্র। প্রকৃতি বলতে কিন্তু কেবল এই গাছ-পালা, নদী-পাহাড় না। আবার এদের ছাড়াও না। আমরা সময়কে কিভাবে দেখি? দিন-কাল-তারিখের বেড়াজালে। প্রকৃতির কোলে কিন্তু এই সময়টাও একটা অঙ্গ। ঐ যে বললাম আমরা এই শক্তিটার একটা ক্ষুদ্র বিন্দু, তাই এর সব রস আমরা বুঝব না। কিছু জিনিস আমাদের ছুঁয়ে চলে যাবে। সময়টাও তা'ই। টাইম তো একটা ডাইমেনশন, আরও গভীরে দেখলে এটা বোধহয় প্রকৃতির সত্তার একটা গঠন।

আইনস্টাইন যেমন "mysterious player"কে উপলব্ধি করেছিলেন, কবিও শুনেছিলেন তার সুর –

"তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী,

অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।"

এই সুরটা কি আমরা শুনতে পাবো না ? অবশ্যই পাব, কিন্তু তার জন্য দরকার উপলব্ধি। কোথায় গেলে সেই সুরটা বাজবে ? কোথাও না নিজের মধ্যেই পাওয়া যাবে। নিজের ভেতর থেকেই উঠবে সেই প্রতিধ্বনি। কিন্তু আমরা নিজেকেই তো ভুলিয়ে রেখেছি। কখনও খুঁজতেই চাইনি আত্মস্বরূপ! তাই হয়ত বিশ্বকবি শুনলেন আর আমরা মুখিয়ে থাকলাম।

তিনি বলেছেন –

"আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।।

....

আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,”

কথাটা হয়ত রবির নয়, প্রকৃতির। সর্বশক্তির উৎসটা এভাবেই সবার মধ্যে ভাগ হয়ে আছে। ভাগ হয়ে আছে বলাটা হয়ত ভুল হবে, সবার মধ্যে বেঁচে আছে। আমরা যে কথাগুলো ভাবছি, সেটাও তো প্রকৃতির ভাবনা; কেননা আমরাও তো একটা অংশ তার।

এই মহাবিশ্ব পরিচালনার দায়িত্ব কার ? তাহলে একটু বিশ্লেষণ করতে হয়। ধরা যাক আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। ঐ সময় আমাকে পরিচালনার দায়িত্ব কার – আমার পায়ের, হাতের মাথার নাকি অন্য কোন অঙ্গের ? নিশ্চয় কোন নির্দিষ্ট অঙ্গের নয়, বরং সমস্ত অঙ্গের মিলিত কাজ এটা। সবগুলোরই সমান অংশদারিত্ব। তাহলে মহাবিশ্বকে কে পরিচালনা করবে? নিশ্চয় বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না যে প্রকৃতির ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সমস্ত অংশের দায়িত্ব এটা। দায়িত্ব বলা ভুল হবে, এটা তো আমাদের কাজ যে কাজটাই আমরা সারাক্ষণ করে যাচ্ছি। আমদের ছোট ছোট ভাবনাগুলোও নেচারের ভাবনার একটা অংশ কারণ আমরা যে নিজেরাই নেচারের একটা অংশ। কিন্তু তারপরও প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ সবটাই আমাদের কাছে শুধু অচেনাই নয়, বিস্ময়করও। রাতের আকাশের ওপারে কোন যে অন্ধকারের দেশ গুনগুন করে গান করেই চলেছে আমরা জানিনা। সূর্যের আলোর দিগন্তে কোন তারা তার রাজত্ব চালাচ্ছে! দূর মহাকাশ তো অনেক দূরের ঘটনা। সময় স্রোতটাই তো আমাদের ভাবিয়ে তুলে। যেভাবে সময়ের স্রোত প্রবাহিত হতে হতে সবকিছু বদলে রেখে দেয় ! একটা সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার সময় জানেনা পরের দিনের সূর্য কোন সাম্রাজ্যকে জন্ম দেবে ! আমরা না ইতিহাসটা দেখতে পাই না ভবিষ্যৎটা। যেটা দেখতে পাই সেটাকে বর্তমানের নাম দিয়ে খনন করতে থাকি নিজেদের কারুকার্য যেন এই কার্যকলাপটা ভবিষ্যতের ডায়েরিতে ইতিহাস হয়ে থাকে।

প্রকৃতির সমগ্র সত্তাটার কিন্তু এই সমস্ত কিছুর ওপরই প্রভাব। সময় আমাদের কাছে একটা বিস্ময়, কিন্তু তার কাছে কেবলই একটা অংশ। নিজের সত্তারই একটা অংশ যা দিয়ে সে চতুর্থ ডাইমেনশনে ছবি আঁকে।

কবিগুরু বলছেন –

“বিশ্বে তোমার লুকোচুরি, দেশ-বিদেশে কতই ঘুরি –

এবার বলো, আমার মনের কোণে দেবে ধরা, ছলবে না।”

কবিও খুঁজছেন তার সম্পূর্ণ সত্তাটাকে। কিন্তু ধরা দিচ্ছে না সে। নাকি আমরা আমাদের এই সামান্য অস্তিত্ব দিয়ে ধরতেই পারব না তাকে ? সে কি সত্যিই কোথাও লুকিয়ে ? না, একেবারেই না। প্রকৃতি তার সমস্ত গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। শুধু আমাদের সাধ্য হচ্ছেনা সেটাকে সম্পূর্ণ রূপে অনুধাবন করার।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভেতর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাটার মধ্যেও সেই শক্তিটা বিরাজমান যার নাম আমি ‘প্রকৃতি’ জানি। আবার মহাকাশের অনন্ত সাম্রাজ্য পেরিয়ে কোন একটা মুহূর্তেও সেই একই রূপখানি হাসছে, গান করছে, সুর লিখছে। আমরা শুধু খুঁজেই চলেছি, খুঁজেই চলেছি। বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যেও যেমন তার রূপ, আবার বাষ্পের মধ্যেও; দূরে কোন নক্ষত্রের মধ্যে, ফুটতে থাকা লাভার মধ্যেও। কবি কিন্তু তাঁর স্বাদটা পেয়েছিলেন। হারিয়ে গিয়েছিলেন তার মাধুর্যে, তার চেতনায়, তার উপলব্ধিতে। তার গানে গলা মিলিয়ে গাইতে চেয়েছিলেন মহাবিশ্বের কোন এক চিরসত্য আওয়াজ। যে আওয়াজটা ঈশ্বরের নয়। কেননা ঈশ্বরের সত্তা তো আমরা তৈরি করেছি। এই শক্তিটা আমাদের গড়ে তুলেছে, আবার বলা যায় এই শক্তির একটা অবিচ্ছিন্ন অংশ থেকে আমরা তৈরি হয়েছি। যার কোনরূপ নেই, অবস্থান নেই। কারণ সে নিজেই অবস্থা তৈরি করে। যার কোন গন্ধ নেই, কারণ সে তার ল্যাবরেটারিতে গন্ধ তৈরি করেছে আবার তার ভাষা গবেষণাগারে এই নামটাও দিয়েছে। এই রূপহীন, গন্ধহীন, বর্ণহীন অস্তিত্বটার জন্যই কবি ব্যাকুল হয়েছেন। কবির কবিতা গুলোতেও ফুটে উঠেছে তাকে খোঁজার নেশা, মাতোয়ারা রূপ আর না পাওয়ার বেদনা। অবশেষে কবির উপলব্ধি! উপলব্ধির নয়ন

দিয়ে শেষমেশ তিনি খুঁজে পেয়েছেন সেই অস্তিত্বকে। হ্যাঁ তার আর কোনও নাম বোধহয় দেওয়ার সাধ্য আমাদের নেই। সে তো কেবলই অস্তিত্ব মাত্র। সেই পরম শক্তির অন্তরে বিশ্বকবি নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন –

"আমি হেথায় থাকি শুধু

গাইতে তোমার গান,

দিয়ো তোমার জগৎসভায়

এইটুকু মোর স্থান।"

রুবাইয়া জেসমিন (জুঁই) – জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির একটি প্রত্যন্ত গ্রাম সাপ্টাবাড়িতে জন্ম। বাংলা সাহিত্যে মাস্টার ডিগ্রি করে এখন অস্থায়ীভাবে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত আমি। তার সাথে লেখালেখি। দৈনিক কাগজ আজকাল, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, উত্তরের সারাদিনে লেখা প্রকাশিত হয় নিয়মিতভাবে, আসাম হিলস টাইম ইংরেজি সংবাদপত্রে একটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ হয়। এছাড়া ''তিস্তা কন্যা পত্রিকা''র সম্পাদনা।

জয়দেব সাহা – বর্তমানে জলপাইগুড়ি গভর্ণমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। ইতিমধ্যেই আনন্দবাজার ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় অনুগল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য তার প্যাশন।

বইপাড়া

বই ঃ **ছয় নারী যুগান্তকারী**

লেখিকা ঃ জয়তী রায়

প্রকাশক ঃ পত্র ভারতী

তেতাল্লিশতম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় এবারের সংগ্রহে যে সকল বইদের স্থান দিয়েছি তাদের মধ্যে অন্যতম হলো আমাদের সকলের প্রিয় লেখিকা জয়তী রায়ের লেখা, পৌরাণিক চরিত্র অবলম্বন করে 'ছয় নারী যুগান্তকারী'। যারা যুগ যুগ পেরিয়ে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছেন তাদের রূপে নয় গুণের জোরেই।

এবার প্রশ্ন হতেই পারে কোন সেই ছয় নারী যাঁদের নিয়ে লেখা হলো গল্প ? কেনই বা তাঁরা আর পাঁচ জনের চেয়ে আলাদা ? কেনই বা তাঁরা আজও উজ্জ্বল হয়ে আছেন মানুষের হৃদয়ে ?

এ সব কটা উত্তর লেখিকা তাঁর লেখার পরতে পরতে সাজিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রথমেই তুলে ধরেছেন পৌরাণিক চরিত্র ধর্ষিতা এক নারী তুলসী কে। কীভাবে ছলনার বশে তাকে ধর্ষণ করেছিলো তার ইষ্ট দেবতা নারায়ণ, যার ফলে অকালে বিনাশ হতে হয় তুলসীর স্বামী বীর যোদ্ধা শিবভক্ত জলন্ধর কে। আর তুলসী ... ? সবটা যখন বুঝতে পারলেন তখন স্বামীকে হারিয়ে ধর্ষিতা এক নারী গগন বিদারী চিৎকারে অভিশাপ দিয়েছিলেন তার ইষ্ট দেবতাকে পাথরে পরিণত হতে। এর থেকে বোঝা যায় দেবতারাও অনাচারী, অনিষ্টকারী, ধর্ষক ছিলেন। তাদের পাপের শাস্তি তবে কার হাতে ছিল !

এর পর আসি লেখিকার তৈরী (মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্যের) এক উপেক্ষিতা নারী শূর্পণখার কথায়। যিনি বারবার প্রশ্ন করেছেন রাম কে, সীতা হরণের জন্য পরোক্ষ ভাবে দায়ী কে ? সেদিন যদি অনার্যা নারীর সহজ সরল প্রণয়কে গ্রহণ করতে নাই পারতেন রাম, তবে তাকে রাক্ষসী, মায়াবী, আক্রমণকারিনী আখ্যা দিয়ে সত্যের ইতিহাস কে আড়াল নাই বা করতেন। সত্য কথা যুগের পর যুগে মানুষের সামনে কেন আনতে পারেন নি ? আর্য জাতি বীর হতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল ছলনা, চাতুর্য যা দ্রাবিড় বা অনার্যদের কাছে অচেনা। তারা বীর যোদ্ধা, বুদ্ধিমান, শিব ভক্ত, সহজ, সরল জীবনে তারা বিশ্বাসী।

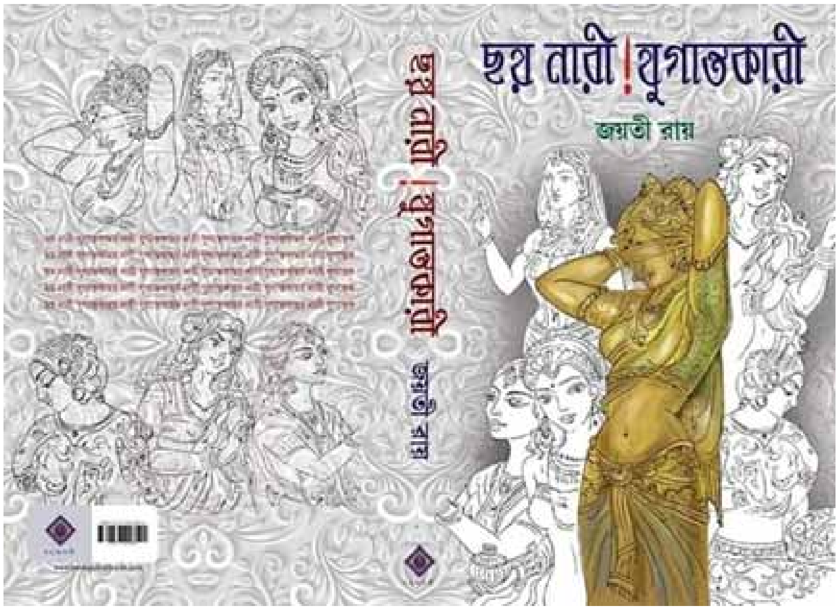

ভালোবাসাকে সহজে স্বীকার করে নিতে যেমন জানে তেমন প্রত্যাখ্যান কেও মেনে নিতে জানে। তাহলে সেদিন দুই ভাই ওমন করে প্রণয় প্রণয় খেলা না খেলে সহজেই বলতে পারতেন ভালোবাসেন না তাকে। ওরকমভাবে হাত মুড়িয়ে কান কেটে, নাক কেটে অপমান না করলে আজ মহাকাব্যের সীতা হরণ পর্বই হয়তো হতো না। একবার ভেবে দেখতে হবে সীতা হরণের জন্য পরোক্ষভাবে মহারাজ রাম কি দায়ী নন ?

গল্পের যেখানে ছোট্ট ছোট্ট ব্যাখ্যায় লেখিকা আর্যা অনার্যা দুই নারী মানে সীতা ও শূর্পণখার একই পুরুষের প্রতি উপেক্ষা, প্রেম, বিরহ বেদনা কে তুলেধরেছেন সুন্দর ভাবে তা সত্যি ভাবিয়ে তুলবেই।

মহর্ষি ব্যসদের সৃষ্ট মহাকাব্যের তিন নারী গান্ধারী, কুন্তী, উলূপী কে নিয়ে লেখিকার রচনা বার বার চিন্তা করাতে বাধ্য করে পুরুষ তান্ত্রিক সমাজের নারীর প্রতি পুরুষের আচারণ ও তাদের মানসিকতার। যা আজও সমাজে বিরাজমান। প্রতিবন্ধকতা শরীরে নয় মনে। যেমন ঃ স্নেহান্ধত্বতা, কাম, ক্ষমতা, লোভ, লালসা, বৈধ, অবৈধ সম্পর্ক, ভালোবাসার মর্যাদা না দেওয়া এসব সমাজে তখনও ছিল আজও আছে।

অবশেষে ষষ্ঠ নারীতে এসে দাঁড়াতেই লেখিকার সৃষ্ট ‘খনা এক সত্য’ তে গায়ে কাঁটা দিতে থাকে। বিদূষী খনা কে দ্রাবিড়ীয় বলে এবং শিক্ষিত নারী বলে (রাজা বিক্রমাদিত্যে সভার নবরত্নের এক রত্ন) শ্বশুর জ্যোতির্বিজ্ঞানী বরাহ আর প্রথমে প্রেমিক তারপর স্বামী মিহিরের কাছ থেকে পাওয়া এক একটি অপমান কে কিভাবে সহ্য করতে হয়েছে তা পড়লে সত্যি বলতে ইচ্ছা করে সমাজ কি আজও পরিবর্তন হয়েছে ? বুদ্ধিমতী, বিদূষী নারী কি পুরুষের পাশাপাশি আজও সমান ভাবে সর্বত্র বিরাজ করার অধিকার পাচ্ছে ? আজও দেশে বিদেশে নারী জাতির উপর মৌলবাদ সবচেয়ে বেশী কর্যকর। কারণ হয়তো লুকিয়ে আছে এখানেই।

খুব সহজ ভাষায় চেনা গল্পগুলিকে বর্ণনা করা হয়েছে যা সকল স্তরের মানুষের কাছে তা উপভোগ্য। সকলে একবার পড়ে দেখতেই পারেন।

PELÍCULAS